ঢাকাহল বার্ষিকী

১৩৩১ সন।

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]

সম্পাদক—শ্রীপরেশচন্দ্র নন্দী।

[মূল্য প্রতিসংখ্যা আট আনা]

সূচীপত্র।

১। কৈফিয়ৎ।

২। আবাহন (কবিতা) শ্রীবীরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ... ... ১ পৃষ্ঠা

৩। সহর-বাসের কথা, অধ্যাপক শ্রীঅজিতকুমার সেন এম, এ ... ... ২ "

৪। কবি (কবিতা) শ্রীসুখেন্দ্রচন্দ্র পাল ... ... ৭ "

৫। পাগলের চিঠি, শ্রীঅমূল্যচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ, ... ৮ "

৬। হক্ কথা (নাট্যকবিতা) শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র নাগ বি, এ, ... ১০ "

৭। ঢাকার শঙ্খশিল্প শ্রীকুমুদরঞ্জন চৌধুরী বি, এ, ... ১৪ "

৮। প্রতিশোধ (কবিতা) শ্রীশিবদাস ... ... ২৩ "

৯। গৃহস্মৃতি (কবিতা) শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ... ... ২৪ "

১০। চিত্র ও চিত্রকর শ্রীনীরদবন্ধু চৌধুরী ... ... ২৫ "

১১। দীক্ষা (কবিতা) শ্রীঅনঙ্গমোহন ভৌমিক ... ... ২৮ "

১২। আসল ও নকল শ্রীতাপসকুমার দত্ত বি, এ; ... ... ২৮ "

১৩। পাষাণে শৈবাল (কবিতা) শ্রীশিবদাস। ... ... ৩৪ "

১৪। দুই বন্ধু (গল্প) শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এ ... ... ৩৫ "

১৫। কর্ম্ম ও জ্ঞান শ্রীমন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য বি, এ; ... ... ৪১ "

১৬। ফাগুনের ব্যথা (কবিতা) শ্রীহেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ... ... ৪৪ "

১৭। রেডিয়ম রহস্য অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এস্ সি ... ... ৪৫ "

১৮। কবি (গল্প) শ্রীসুশীলচন্দ্র সেন গুপ্ত ... ... ৫১ "

১৯। নাট্যেস্বপ্ন শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী বি, এ ... ... ৫৭ "

২০। দিনান্তে (কবিতা) শ্রীবিধুশেখর দাস ... ... ৬১ "

২১। কি খাইব? ডাঃ শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সরকার এম, এ; পি, এইচ, ডি; পি আর এস্ ৬২ "

২২। ভোরের শিশির (কবিতা) শ্রীমনোমোহন রায় ... ... ৭৮ "

২৩। আসার আশায় (কথিকা) শ্রীরথীন্দ্রকুমার গুহরায় বি, এ ... ... ৭৯ "

২৪। দাক্ষিণাত্যে দিনত্রয় (ভ্রমণ) অধ্যাপক শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল ৮১ "

২৫। কামনা (কবিতা) ... শ্রীসুখেন্দ্রচন্দ্র পাল ... ... ৮৮ "

২৬। কৌতুক-কণা ... ... ৮৯ "

২৭। একটী কথা ... শ্রীওয়ালটার এলান্ জেঙ্কিন্স আই, ই, এস্ ... ৯৩ "

২৮। আমাদের কথা ... ... ৯৪ "

ঢাকাহল বার্ষিকী

১৩৩১ সন।

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]

সম্পাদক—শ্রীপরেশচন্দ্র নন্দী।

[মূল্য প্রতিসংখ্যা আট আনা]

সূচীপত্র।

১। কৈফিয়ৎ।
২। আবাহন (কবিতা) শ্রীবীরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ... ... ১ পৃষ্ঠা
৩। সহর-বাসের কথা, অধ্যাপক শ্রীঅজিতকুমার সেন এম, এ ... ... ২ ”
৪। কবি (কবিতা) শ্রীসুখেন্দ্রচন্দ্র পাল ... ... ৭ ”
৫। পাগলের চিঠি, শ্রীঅমূল্যচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ, ... ৮ ”
৬। হক্ কথা (নাট্যকবিতা) শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র নাগ বি, এ, ... ১০ ”
৭। ঢাকার শঙ্খশিল্প শ্রীকুমুদরঞ্জন চৌধুরী বি, এ, ... ১৪ ”
৮। প্রতিশোধ (কবিতা) শ্রীশিবদাস ... ... ২৩ ”
৯। গৃহস্মৃতি (কবিতা) শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ... ... ২৪ ”
১০। চিত্র ও চিত্রকর শ্রীনীরদবন্ধু চৌধুরী ... ... ২৫ ”
১১। দীক্ষা (কবিতা) শ্রীঅনঙ্গমোহন ভৌমিক ... ... ২৮ ”
১২। আসল ও নকল শ্রীতাপসকুমার দত্ত বি, এ ; ... ... ২৮ ”
১৩। পাষাণে শৈবাল (কবিতা) শ্রীশিবদাস। ... ... ৩৪ ”
১৪। দুই বন্ধু (গল্প) শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এ ... ... ৩৫ ”
১৫। কর্ম্ম ও জ্ঞান শ্রীমন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য বি, এ ; ... ... ৪১ ”
১৬। ফাগুনের ব্যথা (কবিতা) শ্রীহেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ... ... ৪৪ ”
১৭। রেডিয়ম রহস্য অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এস্ সি ... ... ৪৫ ”
১৮। কবি (গল্প) শ্রীসুশীলচন্দ্র সেন গুপ্ত ... ... ৫১ ”
১৯। নাট্যোস্বপ্ন শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী বি, এ ... ... ৫৭ ”
২০। দিনান্তে (কবিতা) শ্রীবিধুশেখর দাস ... ... ৬১ ”
২১। কি খাইব ? ডাঃ শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সরকার এম, এ ; পি, এইচ, ডি ; পি আর এস্ ৬২ ”
২২। ভোরের শিশির (কবিতা) শ্রীমনোমোহন রায় ... ... ৭৮ ”
২৩। আসার আশায় (কথিকা) শ্রীরথীন্দ্রকুমার গুহরায় বি, এ ... ... ৭৯ ”
২৪। দাক্ষিণাত্যে দিনত্রয় (ভ্রমণ) অধ্যাপক শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল ৮১ ”
২৫। কামনা (কবিতা) ... শ্রীসুখেন্দ্রচন্দ্র পাল ... ... ৮৮ ”
২৬। কৌতুক-কণা ... ... ৮৯ ”
২৭। একটী কথা ... শ্রীওয়ালটার এলান্ জেঙ্কিন্স আই, ই, এস্ ... ৯৩ ”
২৮। আমাদের কথা ... ... ৯৪ ”

কৈফিয়ৎ

আর একটী বৎসর কালের ক্রোড়ে বিলীন হইয়াছে, 'শতদলের' একবৎসর কাল বয়ঃক্রম পূর্ণ হইয়াছে। প্রথম যখন দিবার আলোকের স্পর্শে পাখীর মত হৃদয়ে একটা নূতন আনন্দের এবং নূতন জীবনের স্পন্দন লইয়া, গেল বৎসর ঠিক এমনি সময়ে আমরা জগতের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলাম, তখন যে ভিতরে ভিতরে একটা ভীতি এবং সন্দেহ আমাদের মনে ছিল না, এমন নয়। 'না জানি আমাদের এই উদ্যম কতটুকু সাফল্য লাভ করে'—'না জানি আমাদের এই কাজ দেখিয়া কে কি মনে করে'—এমনি একটা অনিশ্চয়তা, একটা আতঙ্ক এবং একটা অবিশ্বাস আমাদের সকল প্রচেষ্টার ভিতর লুক্কায়িত ছিল। রঘুদের অন্বয় বর্ণনা করিতে যাইয়া শক্তিশালী কবি ও যদি নিজেকে প্রাংশুলভ্য বস্তুর লোভে লুব্ধ উদ্বাহু বামনের মত উপহাস্য মনে করিতে পারেন, তাহা হইলে, আজ সাহিত্যের এই বিরাট বিকাশের দিনে আমাদের উপহাস্য হওয়ার আশঙ্কাটা মোটেই ভিত্তিহীন ছিল না। সাহিত্য-সৃষ্টি আজ নানা আকার ধারণ করিয়া মানবের চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে; এমনি দিনে সৃষ্টির কৌশল যার অবিদিত, অলব্ধ বিদ্যার ফলের মত তাহার ভাগ্যে কিছুই জুটিবে না, ইহা আর আশ্চর্য্যের কথা কি? যাহার দেবতাকে দিবার মত কিছুই নাই, যাহার নৈবেদ্যের উপকরণ শূন্য, সেই দীন ভক্তকে মন্দিরের দুয়ার হইতেই পূজারি ফিরাইয়া দেয় না, এমন ত নয়। যেখানে প্রচুর ধন-সম্ভারে সজ্জিত নৈবেদ্যের থালা লইয়া দেশের রাজা মহারাজা দেবতার দুয়ারে প্রণত হইয়াছেন, সেখানে রিক্তহস্ত দরিদ্রকে কে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেয়? যেখানে প্রবীণদের হাতে সাধা সুরে দেবীর বীণা বাজিয়া উঠিয়াছে, যেখানে সিদ্ধকণ্ঠ গায়কদের সঙ্গীতে সাহিত্যের আসর মাতিয়া উঠিয়াছে, সেখানে শিক্ষানবীশের অসিদ্ধ হস্ত কোন্ তান বাজাইবার আস্পর্দ্ধা রাখিতে পারে? আর সেখানে কোন্ অধিকারে নবীন গায়ক গাইবার আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে? তাই, আমরা যখন গত বৎসর আমাদের তন্ত্রীতে-হীন বীণাখানি হাতে লইয়া সাহিত্যের মজলিসে দাঁড়াইতে সাহস করিয়াছিলাম, তখন নিজেদের দৈন্যে নিজেরাই লজ্জিত হইয়াছিলাম এবং আমাদের ধৃষ্টতা আমাদিগকেই তিরস্কার করিয়াছিল।

কিন্তু প্রবীণদের অনুকম্পায় আমরা বঞ্চিত হই নাই। যাঁদের নিকট ভর্ৎসনা আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাঁহারা স্নেহ দেখাইয়াছেন; যাঁদের তিরস্কারের ভয়ে হৃদয় কাঁপিয়াছিল, তাঁদের নিকট পুরস্কার পাইয়াছি; আর যে গুরুগম্ভীর সমালোচকদের নিকট কশাঘাত প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, তাঁহারা কিছুই করেন নাই। সুতরাং আমাদের উৎসাহ বাড়িয়াই গিয়াছে; আমরা উবিয়া যাই নাই; সাহস করিয়া দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিতেছি।

মনে হয়, সেবার মূল্য প্রদত্ত জিনিসে নয়, হৃদয়ের একনিষ্ঠায়। পূজায় যে বেশী টাকা খরচ করে, তাহারই ভক্তি বেশী নয়; এমন কি, যাহার দেবগৃহ সুসম্পন্ন তাহারও ভক্তি সেই জন্যই বেশী নয়। কিছু দিবার শক্তি যার নাই, ঐকান্তিক সেবা করিবার আকাঙ্ক্ষা তাহারও থাকিতে পারে; সুতরাং কিছুই দিতে পারিল না বলিয়া উপাস্য দেবতা তাহার ভক্তি অবহেলা করিবেন, এমন নয়। আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টার ফল বিরাট আকার ধারণ করিয়া বিশ্ব-সাহিত্যের আসরে প্রকাণ্ড স্থান জুড়িয়া বসিবে, এমন স্বপ্ন আমরা দেখি নাই; কিন্তু তাই বলিয়া পূজা করিবার অধিকারও আমাদের নাই, তাহাও স্বীকার করি না। আমাদের এ চেষ্টা সাহিত্যজগতে বিজয়-অভিযান নহে; ইহা নিঃস্ব ভক্তের ভক্তির প্রকাশ মাত্র।

পাকা হইয়া ফল বৃক্ষের শাখায় জন্মগ্রহণ করে না; কুঁড়ি না হইয়াই ফুল একেবারে প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভ বিতরণ করে না। হওয়ার এবং ফোটার মাঝখানে ফুটিবার যে চেষ্টা, এর ভিতরে যে জগতের কত খানি সৌন্দর্য্য এবং কত খানি আনন্দ প্রকটিত হইয়াছে তাহা কে জানে? এ পৃথিবীতে যদি সব জিনিসই পাকা হইয়াই আসিত, কাঁচা হইয়া আসিয়া পাকা হইবার চেষ্টার স্থান যদি এখানে না থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীর লোকসান কত খানি হইত, কে তাহা বলিতে পারে?

সাহিত্যেও তেমনি কেহ পাকা হইয়াই আসে না; পাকা হইলেই তাহার আসন উচ্চে স্থাপিত হয় বটে, কিন্তু কাঁচা হইতে পাকা হইবার যে চেষ্টা, সেটা প্রায়ই ইতিহাসের প্রচ্ছন্ন কোটরে নিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। এই যে হওয়ার চেষ্টা, এই যে বিকাশের চেষ্টা, এইটাকেই আমরা ধরিয়া রাখিতে চাই। পাকা যাঁরা, প্রবীণ যাঁরা, তাঁদের সাহচর্য্য আমরা আকাঙ্ক্ষা করি, তাঁদের অঙ্গুলি-সঙ্কেতে আমরা পথ চলিতে পারিব, আশা করি; কিন্তু যাদের এখনও সে অবস্থাপ্রাপ্তির ঢের দেরী, তাদের ভিতরে হওয়ার যে চেষ্টাটা সুপ্ত রহিয়াছে সেইটীকেই আমরা বিশেষ ভাবে জাগাইয়া তুলিতে চাই—সেইটীকেই আমরা বিশেষ করিয়া আকার দিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে চাই। কোরকের প্রস্ফুটন চেষ্টার যা সৌন্দর্য্য, তার বেশী দাবী আমরা করি না।

ইংরেজী রাজার ভাষা, শিখিতে হয়; শিখিবার অনেক প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমাদের সাহিত্য-চেষ্টা ঠিক ইংরেজীর সাহায্যে সফল হইবে কি না সন্দেহ। যাঁরা ইংরেজীর চর্চ্চাই বেশী করিয়া করেন, তাঁরা পাণ্ডিত্যের খনির ভিতরে মজিয়া আছেন; কিন্তু বাংলা দেশের এবং বাঙালীর শিল্পের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ পরিচয় এখানে হইবে না।

ইংরেজীকে আমরা সর্ব্বদাই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি, ইংরেজী বলিবার এবং লিখিবার শক্তিকেও আমরা অত্যন্ত সম্মান করিয়া থাকি। সেই জন্য গত বৎসর 'শতদলের' পাপড়িগুলি দুই রঙে রঙানো ছিল। কিন্তু সাহিত্যিকেরা বলেন, দুই নৌকায় পা রাখিয়া মানুষ যেমন পথ চলিতে পারে না, দুই ভাষায় কথা কহিয়াও মানুষ তেমনি সাহিত্যিক হইতে পারে না।

আরও একটা গোপন সত্য আছে, সেটা কাণে কাণে বলিতে হয়; বাঙ্গালীর হাতে নাকি ইংরেজী তেমন স্বাভাবিকতা লাভ করে না; অথচ এইটী না হইলে নাকি সাহিত্যই হয় না। এই সব নানা কারণে আমরা একেবারে খাঁটী বঙ্গীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিতে বাধ্য হইয়াছি। ধার করা পোষাক দিয়া দৈন্য গোপন করার চেষ্টার ভিতরে যে একটা হীনতা আছে, তাহা ইহাতে অপসৃত হইবে, আশা করি।

শতদল

২য় বর্ষ	ফাল্গুন	১৩৩১

আবাহন

(শ্রীবীরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়)

হে সাধক ভক্ত, বাণীর পূজারি, আজি এ তীর্থে এস হে,
নব আভরণে নবীন কুসুমে নবীন অর্ঘ্য সাজ হে ;
হেথা ভারতের নব গুরু-কুল,
নবীন জ্ঞানের নালন্দা অতুল,
ভারতে নবীন জ্ঞানের কেন্দ্র হেথা এ প্রতিষ্ঠান ;
শুভ ভবিষ্যৎ তুলুক গড়িয়া ভূত বর্ত্তমান।
ভারতের জ্ঞান গরিমা মহান্,
আজিকে আবার করিয়া ধ্যায়ান্,
বিশ্বের বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডারে ঢালিবে সম্পদ্ যারা,
এই পূণ্য পীঠে সাধনা করিয়া গড়িয়া উঠিবে তারা।
হেথা একদিন উঠিবে ধ্বনিয়া,
মহা মিলনের মন্ত্র রণিয়া,
আর্য্য সামীয় প্রতীচী নীতি হেথা আলিঙ্গ' দিয়া
গড়িয়া তুলিবে বিরাট্ এক মহামানবের হিয়া।
এস হে সাধক, বাণীর পূজারি, সাজাও পূজার ডালা,
আন দূর্ব্বাদল, বিকচ কমল, আন মন্দার মালা।
হে বিধাতঃ, তব প্রীতি উছলিত দিঠিতে মহান্
সার্থক হউক, সুন্দর হউক, মোদের এ শুভ অনুষ্ঠান।

সহর-বাসের কথা

(শ্রীঅজিতকুমার সেন এম, এ)

আজকাল আমাদের বাঙলা দেশে একটা কথা প্রায়ই শুন্‌তে পাওয়া যায়—'চল, সবাই গ্রামের দিকে ফিরে চল; সহর-বাস একটা অস্বাভাবিক জিনিষ, সহরের ছায়াও মাড়ান উচিত নয়।' এই কথাটার মধ্যে দুটি গলদ আছে। বাঙলায় পল্লীর কোল খালি ক'রে সকলেই যে সহরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ছে না, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বরঞ্চ আমরা এই অভিযোগ করতে পারি—এবং সে অভিযোগটী খুবই ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত—যে, বাঙালী বড় বেশী রকম পল্লীপ্রেমিক, সহরের দিকে তার মোটেই প্রাণের টান নেই। দ্বিতীয় গলদটি এই যে বাঙালী যদিই বা গ্রাম ছেড়ে সহরের দিকে ছুটে থাকে, তবে তাতে বিশেষ দোষের কিছুই নেই—আর তাতে যদি কিছু দোষ থাকে, তবে তার কৈফিয়ৎ হবে, ও দোষে সবাই দোষী। স্বভাব অনুযায়ী হল, না স্বভাবের বিরুদ্ধে হল—মানুষের কাজের ভালমন্দ বিচার এর দ্বারা হয় না; আর যদি বিচার করা হয়, তা'হলে দেখা যাবে যে, মানব সভ্যতা একটা মস্ত বড় লড়াইয়ের ফল; এবং এ লড়াইয়ে বিজিত হচ্ছে সহজাত মনুষ্য-স্বভাব।

এখন দেখা যাক্ বাঙালী সহরপ্রেমিক না পল্লীপ্রেমিক। প্রথমে অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করা যাক্। বাঙলায় লোকসংখ্যা হচ্ছে প্রায় ৪ কোটি ৭৬ লক্ষ, তার মধ্যে সহরবাসী হচ্ছে প্রায় ৩২ লক্ষ; অর্থাৎ শতকরা ৬·৭ জন লোক সহরে বাস করে। [বলা বাহুল্য আমাদের দেশের সাধারণ ছোট ছোট সহরগুলি ইংলণ্ড, জার্ম্মেণী ও মার্কিণের ছোট ছোট সহরের চেয়ে অনেক ছোট।] হলাণ্ডে সহরবাসী হচ্ছে শত করা ৪০·৫ জন, ফ্রান্সে ৪৪ জন, জার্ম্মেণীতে ৬০ জন, স্কটলণ্ডে ৭৫ জন এবং ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সে প্রায় ৭৯ জন। মার্কিণের নিউ ইয়র্ক রাষ্ট্রে ৭৯ জন, ম্যাসাচুসেট্‌সে ৯২·৮ জন, কালিফোর্ণিয়ায় ৬১·৮ জন, ইলিনয়ে ৬১·৭ জন, পেন্‌সিলভেনিয়ায় ৬০·৪ জন, কানেক্‌টিকাটে ৮৯·৭ জন এবং রোড দ্বীপে ৯৬·৭ জন। ইয়ুরোপে পল্লীপ্রেমিক রুষদের মধ্যেও শতকরা ১৩ জন সহরে বাস করে।• এই থেকে এই সিদ্ধান্ত করা বোধ-হয় নেহাৎ অযৌক্তিক হবে না, যে অন্যান্য দেশের সঙ্গে—অন্ততঃ সহরবাস হিসাবে—বাঙালী এক পংক্তিতে বসতে পারে না। কৃষিজীবী রুষরাও শতকরা অনুপাত হিসাবে বাঙলার প্রায় দ্বিগুণ সহরে বাস করে; ফ্রান্সে ৬॥ গুণের বেশী, জার্ম্মাণীতে ৯ গুণ এবং ইংলণ্ডে প্রায় ১২ গুণ। মার্কিণের কোন কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে (যথা, ম্যাসাচুসেট্‌স্) আর তুলনা না করাই ভাল, কারণ আমাদের সহরবাসের দৈন্য তাতে বেশী রকমই ফুটে বেরুবে।

কেউ কেউ হয়ত বলবেন—বেশ কথা, মেনে নিলাম যে, সহরবাসের তরফ থেকে দেখতে গেলে বাঙালীকে বিশ্বের দরবারে ঢুকতে দেওয়া হবে না ; কিন্তু বিশ্ব ছেড়ে ছোট বিশ্বের—অর্থাৎ ভারতের দরবারে তো বাঙালী মাথা হেঁট করবে না। আমরা বলব বাঙালীর সেখানেও মাথা হেঁট—সেখানেও বাঙালীর আসন অনেকের পরে। দরবারে ভারতের প্রদেশগুলি যখন একে একে আসন নিচ্ছে, তখন যদি দর্শকদের মধ্যে কেউ আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে ব'লে উঠেন—সব আগত ঐ, বাঙলা তবু কই—তাতে আমাদের কিছু আর বলবার নেই, আমরা লজ্জায় শুধু অধোবদন হ'য়ে থাকব।

ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রদেশেই সহরবাসটা বাঙ্গলার চেয়ে বেশী—এ বিষয়ে বাঙ্গলার পিছনে বিহার ও উড়িষ্যা, আসাম এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত। বোম্বায়ে শতকরা প্রায় ২৩ জন লোক সহরে বাস করে এবং বরোদা ও নিকটবর্ত্তী মিত্ররাজ্য সমূহে সহরবাসীর সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ১৭·৩ জন। অন্যান্য প্রদেশগুলির হিসাব এইরূপ ঃ—মহীশূর ১৪·৪ জন, রাজপুতনা ও আজমীর ১৪·৩ জন, কোচীন ১২·৯ জন, মাদ্রাজ ১২.৪ জন, পঞ্জাব ও দিল্লী ১১.৩ জন, যুক্ত প্রদেশ ১০·৬, ত্রিবাঙ্কুর ১০·১, বেলুচিস্থান ৯·৮, ব্রহ্মদেশ ৯.৮, হায়দ্রাবাদ ৯·৫, মধ্যভারত (করদ) ও গোয়ালিয়র ৯·৪, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ৯, কাশ্মীর ৮.৮, বাঙ্গলা ৬·৭, উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত ৬.৬, বিহার ও উড়িষ্যা ৩·৭, আসাম ৩·২। ভারতে এ বিষয়ে বাঙ্গালার স্থান যে কত পিছনে, তা পরিষ্কার রূপেই বোঝা যায়। একটা জিনিষ নজর করার আছে, সেটা এই যে, উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত ছেড়ে দিলে ভারতের উত্তর পূর্ব্বের তিনটি লাগালাগি প্রদেশ—বাঙ্গলা, আসাম এবং বিহার ও উড়িষ্যা—খুবই পল্লীপ্রেমিক। এটাও জানা দরকার যে, সারা ভারতে শতকরা ১০·২ জন লোক সহরে বাস করে।

পল্লীপ্রেমিক এবং সহরের শত্রুর দল হয় ত এতেও নিরস্ত হবেন না, যতই তর্কে হারুন না কেন, আবার নতুন উদ্যমে নতুন তর্ক উত্থাপন করবেন। হয়ত বলবেন—বেশ কথা, স্বীকার করলাম অন্যান্য দেশের তুলনায় এবং ভারতের প্রায় সমস্ত প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গলার সহর-বাসটা তেমন পছন্দসই নয় ; কিন্তু এই যে সহরবাসটা হুহু করে বেড়ে চলেছে, তা আমরা মোটেই পছন্দ করি না। তাঁরা বলেন, 'ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি'র মমতা ছেড়ে বাঙ্গালীরা ক্রমে ক্রমে 'ইঁটের পর ইঁট' ভরা সহরে গিয়ে আস্তানা গাড়ছে—সহরবাসের এই ঝোঁকটা বড়ই বেড়ে চলেছে।

আমরা এ কথার জবাবে প্রথমে বলব যে, শতকরা হিসাবে যে বৃদ্ধি তা একরূপ নগণ্যই—আমাদের মতে বৃদ্ধি আরও অনেক বেশী হওয়া উচিত ছিল। আর এই সহরের দিকে ঝোঁকটা খারাপ মোটেই নয়—বিশেষতঃ বাঙ্গলার এখন যা অবস্থা। ১৮৯১ সালে বাঙ্গলার (এখন বাঙ্গলা বলতে যা বুঝায়) লোকসংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৯৮ লক্ষ, ১৯১২ সালে অর্থাৎ ৩০

বৎসর বাদে বাঙ্গলার লোকসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪ কোটি ৭৬ লক্ষ। ১৮৯১ সালে বাঙ্গলায় সহরবাসীর সংখ্যা ছিল ২২ লক্ষ, ১৯২১ সালে ৩২ লক্ষ লোক সহরে বাস করে বলে জানা গিয়েছে। অর্থাৎ ৩০ বৎসরে বাঙ্গলায় মোট লোক সংখ্যা বেড়েছে ৭৮ লক্ষ; তার মধ্যে সহরের দাবী হচ্ছে ১০ লক্ষ লোকের উপর। আবার এই যে ১০ লক্ষ লোক বৃদ্ধি, এর সবটাই তো আর পল্লীজননীর ক্রোড় থেকে আসে নি। ১৮৯১ সালে বাঙ্গলায় শতকরা ৫'৫৮ জন ছিল সহরবাসী, এখন সেখানে ৬'৭৫ জন সহরবাসী। ৩০ বছরে শতকরা ১'১৭ জন সহরবাসী বেড়েছে। বলাবাহুল্য, এই বৃদ্ধি নামমাত্র। বাঙ্গলায় প্রতি দশবছর অন্তর সহরবাসীর সংখ্যা কত আস্তে আস্তে বাড়ছে তা এই তালিকা থেকেই বোঝা যাবে:—

১৮৮১—	৫'৩৮
১৮৯১—	৫'৫৮
১৯০১—	৬'০৬
১৯১১—	৬'৫২
১৯২১—	৬'৭৫

৩০ বছরে—১৮৯১—১৯২১—সহরবাসীর সংখ্যা বেড়েছে সবে ১০ লক্ষ।

এই বৃদ্ধির উপর খানিকটা দাবী আছে সহর বাসীর নিজের, খানিকটা অবাঙ্গালীর এবং বাকীটা পল্লীজননীর। কলিকাতা ও হাবড়ায় ঐ ৩০ বছরে ৪ লক্ষ লোক বেড়েছে, সুতরাং অন্যান্য সহরে লোক সংখ্যা যে কত কম বাড়্ছে, তাহা স্বতঃই বোঝা যায়। বাঙলায় ৫০ বছরে অর্থাৎ ১৮৭২ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত সহরবাসীর সংখ্যা শতকরা ৫'৩৫ জন থেকে বেড়ে ৬'৭৫ জন হয়েছে; ঐ সময়ে ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের সংখ্যা হচ্ছে ৬১ ৮ এবং ৭৯। প্রতি বর্গ মাইলে বাঙলায় ইংলণ্ডের চেয়ে অনেক বেশী লোক বাস করে; কিন্তু বাঙালী কৃষিজীবী ও পল্লীপ্রেমিক, ইংরেজ ব্যবসাজীবী ও সহরপ্রেমিক। এ কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, যে জাতির জীবিকা শুধু জমির উপরই নির্ভর করে, তার পল্লীগ্রামে এত ঘনসন্নিবিষ্ট ভাবে বাস করা ঠিক যুক্তিযুক্ত নয়। যেখানে কলকারখানা বেশী, ব্যবসাবাণিজ্য বেশী, সেখানে প্রতি বর্গমাইলে যত লোক থাকে, তার চেয়ে অনেক কম লোক থাকা উচিত প্রতি বর্গমাইলে সেই দেশে, যে দেশ কৃষিজীবী। কিন্তু বাঙলায় সবই উল্টা। এর ফল হচ্ছে এই যে, সকলেই জমির উপর ঘেঁসাঘেঁসি করে কোন রকমে একবেলা আধমুঠো খাচ্ছে।

বাঙালী এত পল্লীপ্রেমিক এবং এত সহরবিমুখ কেন? আবার যে সব বাঙালী সহরবাসী তাহারাও যে ষোলআনা সহরপ্রেমিক নয়, তা বোঝা যায় সহরে স্ত্রীপুরুষের সংখ্যা দেখলে। কলিকাতা সহরে প্রতি ২জন পুরুষের জায়গায় ১ জন স্ত্রীলোক আছে এবং ঢাকা সহরে হাজারকরা পুরুষ প্রতি স্ত্রীলোক আছে ৭৭৪ জন। চট্টগ্রাম এ বিষয়ে কলিকাতাকেও টেক্কা দিয়াছে,

কারণ সেখানে হাজারকরা পুরুষ প্রতি স্ত্রীলোক আছে ৫ শতেরও কম। অনেক বাঙালী আছে, যারা নিজেরা সহরে চাকুরী করতে যায়, কিন্তু সঙ্গে পরিবার আনে না। বাঙালীর সহর-বৈরাগ্যের কারণ কি? আমাদের মতে চারটি প্রধান কারণ ঃ—

(১) ব্যবসা-বাণিজ্যে বিমুখতা ;
(২) নির্জ্জীব শান্তিপ্রিয়তা ;
(৩) দারিদ্র্য ;
(৪) একান্নবর্ত্তী পরিবার।

বাঙ্গালী ব্যবসাবাণিজ্য-ঘেঁষা নয় বলেই পল্লীপ্রেমিক। বলা বাহুল্য, যে আধুনিক সহরের ভিত্তিস্থাপয়িতা হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্য। পুরাকালে সহর গড়ে উঠেছিল দুর্গ ও রাজধানী সম্বল করে; ক্রমে ক্রমে ঐ সব জায়গা কেনাবেচার কেন্দ্র হতে লাগল, কিন্তু আজকাল কলকারখানা ও ব্যবসাবহুল স্থান দেখেই সহর তার আস্তানা গাড়তে সুরু করেছে। ১৫ বছর আগে টাটাদের জামসেদপুরের নাম কেউ শোনে নি ; আজ সেখানে ৬০ হাজার লোক ; বছর দশেকের মধ্যে লোক-সংখ্যা ১ লক্ষে দাঁড়াবে। যুক্তপ্রদেশে কাণপুরের উৎপত্তি কলকারখানা থেকে। এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কাশী—এগুলি কলকারখানাবহুল নয়, তাই তেমন বাড়ছে না। বাঙলায় চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, শ্রীরামপুর, ভাটপাড়া কারখানা ও ব্যবসাবহুল—তাই তারা বর্দ্ধমান। কলকারখানা ও ব্যবসাবহুল নয় বলে এবং বাঙালী সহর-বিমুখ বলে আজ মুর্শিদাবাদ, আজিমগঞ্জ, কুমারখালি ও শান্তিপুরের শনৈঃ শনৈঃ লোকসংখ্যা হ্রাস হচ্ছে। ৫০ বছরে মুর্শিদাবাদসহরের লোকসংখ্যা শতকরা ৫৭ জন কমে গিয়েছে। ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসাদে সহর যে কত বড় হতে পারে, তার দৃষ্টান্ত স্থল হচ্ছে লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন ও ভিয়েনা। উনবিংশ শতাব্দী কলকারখানা উদ্ভাবন ক'রে ব্যবসাজগতে যে একটা বিরাট বিপ্লব এনে দিয়েছে, তারই খানিকটা প্রতিচ্ছবি পড়েছে এই সব রাজধানীর লোক-সংখ্যা বৃদ্ধিতে। ১৮০০ সালে লণ্ডনের লোক-সংখ্যা ছিল ৮,৬৪,০০০ ; ১৯০১ সালে বৃহৎ লণ্ডনের লোকসংখ্যা ছিল ৬৫, ৮১, ০০০ ; ঐ ঐ সময়ে প্যারিসের লোকসংখ্যা ছিল ৫৪৭,০০০ এবং ২৭, ১৪,০০০ ; বার্লিনের ১,৭২,০০০ এবং ১৮, ৮৮,০০০ ও ভিয়েনার ২,৩২,০০০ এবং ১৬,৭৪,০০০। ভারতবর্ষে পার্শী ও ভাটিয়াদের প্রসাদে বোম্বাই প্রদেশ ব্যবসা ও কলকারখানাবহুল, তাই সহরবাসীর হিসাবে বোম্বাই ভারতের শীর্ষস্থানীয়।

বাঙালীর নির্জ্জীব শান্তিপ্রিয়তা, জড়ভরত-ভাব বাঙালীর সহরবাসের বিরুদ্ধে। সহরবাসের মধ্যে একটা জীবনের সাড়া আছে, একটা চাঞ্চল্য, একটা হৈচৈ, একটা উন্মাদনা আছে ; কিন্তু বাঙালীর নেশাকরা জড়ভাবের সঙ্গে এই ভাবটা ঠিক খাপ খায় না। খাঁটি সহরবাসী হতে হলে একটু একটু ডানপিটে গোছের হওয়া দরকার; কিন্তু বাঙালী ঘরকুণো হয়ে

ব্যবসাবাণিজ্যকে দশ হাত তফাতে রাখার দরুণ কেমন যেন নির্জীব, আড়ষ্ট হয়ে আছে, নতুন কোনও পারিপার্শ্বিকের মধ্যে নিজেকে ফেলতে চায় না।

দারিদ্র্যটাও সহরবিমুখতার একটা কারণ। সহরে বসবাস করতে হলেই খরচটা একটু বেড়ে যায়, সুতরাং অর্দ্ধাহার-ক্লিষ্ট বাঙালী খরচ যোগাবে কোথা থেকে? কিন্তু এর আর একটা দিক আছে। সহর ও ব্যবসা বাণিজ্যের ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে যদি নিজেকে না ফেলা যায়, তবে দরিদ্র বাঙালীর আর্থিক অবস্থাই বা ভাল হবে কোথা থেকে? এক টুক্‌রো জমির উপর মায়া করে এক কুড়ি লোক যদি সেই জমি কাম্‌ড়ে পড়ে থাকে, তবে আর অবস্থার উন্নতি হবে কোথা থেকে? পল্লীজননীর আদরের কোল ছেড়ে সহরের স্রোতে ঝাঁপিয়ে ব্যবসাবাণিজ্যের সাহায্যে আর্থিক অবস্থার উন্নতি করলে পল্লীজননী মনে মনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন; কারণ, অত লোকের ঠেসা-ঠেসিতে তাঁর অনেকদিন থেকেই শ্বাসরোধের উপক্রম হয়েছে। পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা, নোয়াখালি এবং ত্রিপুরা জেলায় প্রতি বর্গমাইলে ১ হাজারের অধিক লোক বাস করে, ; কিন্তু ব্যবসাপ্রধান ইংলণ্ডে প্রতি বর্গমাইলে ওর অর্দ্ধেকেরও কম লোক বাস করে। অবস্থা যে কি ভীষণ তা' সহজেই অনুমেয়।

একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথাটাও এজন্য খানিকটা দায়ী। এই জন্য অনেকে আধা সহরবাসী, আধা গ্রামবাসী অবস্থায় জীবনটা কাটান; মাঝখান থেকে কোনটারই উপর টান জন্মে না। নিজের এবং নিজের স্ত্রীপুত্রের উদরান্নের সংস্থানের জন্য যদি একজনকে ভাবতে হয়, তবে হয়ত জীবিকার জন্য তাকে সহরে আসতে বাধ্য হতে হয়; কিন্তু সে যদি গ্রামে বসেই ভাবে যে কাকা, কি দাদা তাকে ও তার পরিবারকেও দুমুঠো ভাত দেবে, তার অর্থোপার্জ্জনে চেষ্টা না থাকলেও,—তবে, তার স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জনের পথে কি ঐরূপ চিন্তার ধারা একটা মস্ত বড় কণ্টক নয়? আর যে প্রথা এই চিন্তাধারা গড়তে সহায়তা করে, সে প্রথাও যে একটা কত বড় বিঘ্ন তা বলাই বাহুল্য।

সহর সবরকম বিপ্লবের কেন্দ্র। সামাজিক বিপ্লব বল, অর্থনীতিক বিপ্লব বল, রাজনীতিক বিপ্লব বল, শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তির বিপ্লব বল—সব বিপ্লবের কেন্দ্রস্থল সহর। সহরে নানা শ্রেণীর লোক আছে, বিভিন্ন রুচির লোক আছে; কোটিপতি আছে, আবার দীন ভিখারীও আছে; অসাধারণ পণ্ডিত আছে, আবার গণ্ডমূর্খও আছে;—এই সব পরস্পরবিরোধী লোকদের সংঘর্ষে বিপ্লব উপস্থিত হয়; আর এই বিপ্লবই উন্নতির অগ্রদূত। বাঙ্গালী আজ ব্যবসাবাণিজ্য করে সহরবাসী হউক, তা হলেই বাঙালীর উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

কবি

(শ্রীসুখেন্দ্রচন্দ্র পাল)

ওগো কবি, ওগো আমার কবি,
সুরের দোলায় বিশ্বনাচন,—একি তোমার ছবি !
নিশীথ রাতের চন্দ্র তারা
তোমার সুরের লীলা তারা,
পাখীর গান আর নদীর ধারা, তোমারি গান সবই।
সকল গানের সুরের সৃজন তোমার, আমার কবি !
মায়ের বুকে, ওগো আমার কবি,
কতই সুধা দিলে তুমি, তাহাই আমি ভাবি।
মায়ের প্রাণে এত ভালবাসা,
মায়ের বুকে শিশু খুঁজে বাসা,
এযে সবই তোমার কাছে শেখা, বৃন্দাবনের ওগো শিশু কবি !
বিশ্বময় এ স্নেহের লীলা তোমার হাতের ছবি।
ওগো কবি, ওগো আমার কবি,
তোমার বাঁশী কি গুণ জানে তাহাই আমি ভাবি।
প্রিয়ার বুকে প্রিয়ের লাগি
যে সুর-সুধা উঠে জাগি
বিশ্ব-প্রিয়ার কাণে সে সুর বাজায় তোমার বাঁশী।
প্রেমের সুরে প্রাণের মাতন,—তোমার আঁকা ছবি।
কবি, আমার কবি,
তোমার কাছে কি গান পেল, বাংলা দেশের রবি !
সুর-যে তাহার কাঁপি, কাঁপি
উঠে আকাশ বাতাস ছাপি,
শুনে সবাই অবাক মানে, আমি শুধু ভাবি—
আমার কবির বাঁশী বুঝি ভারত-কবি রবি !

পাগলের চিঠি

(শ্রীঅমূল্যচন্দ্র চক্রবর্ত্তী)

বেওয়ার

রাজপুতনা—

১৩।৯।২২

*   *   *   *   *   *   *   *

*   *   *   হাঁ, তার পর লিখেছিলে জানাতে জায়গাটা দেখে কেমন লাগ্‌ছে।

সন্ধ্যার আগে এক পস্‌লা বৃষ্টি হয়ে গেছে। ঘাস ভিজে গেছে কিন্তু রাস্তা বড় একটা ভিজে নি। সন্ধ্যায় আধখানার চাইতে একটু বেশী চাঁদ উঠেছে। আমি আলো নিবিয়ে দিয়ে দোতালায় জানালার ধারে ব'সে আছি। বোধ হয় তোমায় আগেই লিখেছি—জায়গাটা ভারী নির্জ্জন। আমার বাসার পাশে শুধু আর দুটী ভদ্রলোকের বাসা আছে; আর ঘরের পাছে কয়েকটা নিমগাছ অন্ধকার ক'রে রয়েছে।

কি যে ভাব্‌ছিলাম তার আগাও মনে নেই, গোড়াও মনে নেই। অথচ অনেক কথাই মনে উঠ্‌ছিল এক সঙ্গে। মাঝখানের খানিকটা কথা এখনও মনে পড়্‌ছে—তাই বল্‌ছি।

প্রায় দু'শ' হাত দূর দিয়ে আরাবল্লী সোজা চলে গিয়েছে। গায়ে গাছ-পালার আবরণ নেই বড় একটা। শুধু বড় বড় পাথরের ঢেলা, আর তাদের মাঝখান থেকে দুটা একটা গুল্ম—কোনোটায় বা হলুদে ফুল ফুটেছে, কোনোটায় বা তাও নেই। সন্ধ্যার আগে এখান থেকে বেড়িয়ে এসেছি; তখন কিন্তু মনের কোনো চাঞ্চল্য লক্ষ্য করি নি। তখন আমার সঙ্গে সাথী ছিল। হাঁ, যা বল্‌ছিলাম। চাঁদের আলোয় গিরিশ্রেণী একটু অস্পষ্ট হয়ে গেছে, একটা কিসের মাদকতা যেন আরাবল্লীকে ছেয়ে ফেলেছে! একটু হাওয়া নেই, একটু শব্দ নেই—সব নীরব, নিথর, নিস্তব্ধ! এ যে মর্ম্মন্তুদ হৃদয়-ব্যথার গোপন অশ্রু বিসর্জ্জন! কণ্ঠে ভাষা নেই, দেহে শক্তি নেই, বক্ষে সাহস নেই! তাই তার বুকের হাড় ক'খানা কড়্‌ কড়্‌ করে ভেঙ্গে ফাঁক হয়ে গেছে, আর জমাট-বাঁধা রক্তের ঢেলা বেয়ে দু-এক ফোঁটা পড়্‌ছে—টপ্‌, টপ্‌। মানুষেরও কি এই পরিণাম? দুর্গাদাসের কত অভিযান এ সহরের ভিতর দিয়ে, ওই আরাবল্লীর পাদদেশ দিয়ে চলে গিয়েছে! মাড়াবারের কত শৌর্য্য, আজমীরের কত বীর্য্য যে এই স্থান দিয়ে দিল্লীর দিকে ছুটে চলে গিয়েছে। ক্ষুদ্র কিষেণ-গড় থেকে, চিতোর, উদয়পুর, জয়পুর সমস্তের মাতৃগান তুমি উৎকর্ণ হয়ে শুনেছ। আর আজ! ওগো,

পাষাণের দেবতা, আজ কি তোমার ভিতর সাড়া নেই। চিতোরের বুকে, আরাবল্লীর পেছন্ দিক্ দিয়ে লাল রংঙ্গের একখণ্ড চাঁদ আধখানা হেলে ডুবে যাবার মতই উঠ্‌ছে। আজমীরের দুর্গে প্রস্রবণের জল ঝির্, ঝির্, করে বয়ে কোনো প্রকারে পুরাণো চরণামৃতটুকু সঞ্চিত করে রাখ্‌ছে। মানুষেরও কি এই পরিণাম!

কত কাল ভেবেছি, "কত নিশিযামিনী পোহাইল মোর" তার না আছে হিসাব, না আছে তার নিকাশ! কিন্তু এ ভাব্‌নার শেষ হল কই? সমস্ত মনপ্রাণ উধাও হয়ে কোন্ লক্ষ্যহীন্ কেন্দ্রের দিকে ছুটে চলেছে? সে যে "বিশ্বময় কারে চাহে, করে হায়, হায়!" ভয় পাচ্ছ? ভয় নেই। পাগল হ'ব না। তবে তার স্মৃতিটুকু ভুল্‌তে পারি না। বুকের উপর ছাপ পড়েছিল আঙ্গুলের—তার রং ঠিক তোমারই গাল দুটীর মতন লাল। সে ত সব ভুলে গেছে; কিন্তু আমি ভুলেছি কি? তার নিকট সে স্মৃতি যতটুকু মুছে গেছে, আমার বুকে তা নিজের শক্তিতে ততটুকু বসে গেছে। এখন ভাব্‌ছি, সে লোহিত রাগের ভিতর দিয়ে আমাতে তার চলে যাওয়ার আভাস, না তার চির-বিকাশ! কি যেন একটা কিছু এ প্রাণ চায় অথচ তার নাম জানিনে। অথচ এম্‌নি সে চাওয়ার জোর যে আমার "ঘরে থাকাই দায়।" তাই ঘুরে বেড়াচ্ছি ছন্নছাড়া হয়ে। যেখানে একটু সহানুভূতির আভাস পেয়েছি সেখানেই থেমেছি, আর চক্ষের জল ফেলেছি। কিন্তু—ক্ষুধা মিটে নি। "কিসের অশান্তি ওই মহাপারাবারে, সতত ছিঁড়িতে চাহে কিসের বন্ধন।" কিসের বন্ধন? জানি না। দুঃখ হচ্ছে আমায় দেখে? তা পার যদি বইতে দুঃখের ভার নিও। অনেকেরই এমন এক একটা দিন আসে যখন সে তোমার মত * * * ছেড়ে পাহাড় পর্ব্বতের সঙ্গ নিতে চায়। যারা এ পথের পথিক হয় নি কোনও দিন তারা এর থেকে কোনই অর্থ বুঝ্‌তে পার্ব্বে না। তাদের নিকট এটা নিরেট পাগ্‌লামী। কিন্তু এর প্রাণের স্পন্দনের সঙ্গেই যার প্রাণের স্পন্দনের যোগ আছে, সে তাকে ছাড়্‌তে চায় না—কারণ সে তার বিশ্বসাথী, সে তার তোমারই মত ভালবাসার স্থান। গৌরবের দিনের সঞ্চিত ভালবাসাটুকু দুঃখের দিনেও সে ধরে রাখে; কারণ তার ঘৃণা নেই।

"উপবনে কোকিলার মত আমি নিতি গো
গাহিতাম সুস্বরে গীতি গো।
গেছে সে মধুর স্বর তবু কেন করে নর
এ দেহের পরে এত প্রীতি গো।"

ওকি! ব্যস্ত হয়ে পড়্‌ছ? আর শুন্‌তে চাও না? আচ্ছা, দাঁড়াও—আর দু কথা লিখেই তোমায় ছুটী দিচ্ছি। জোর করে শুনাতে তোমায় চাই নে। এই আরাবল্লীর নীরব কাহিনী থেকে আমার কিন্তু আজ কদিন কটা কথা মনে হচ্ছে। তা কি জান? ফেলে দেবার মত কিছুই

নেই দুনিয়াতে ; তাই আজ আমার মনে হচ্ছে যে আমার এই "আমিটাকে" তপ্ত কড়ায়ের উপর চাপিয়ে রাখার মানে আর কিছুই নয় ; এর মানে হচ্ছে শুধু হৃদ্‌পিণ্ডটুকু আমার গলিয়ে তারই ছাপ মেরে দেওয়া আমার কপালে, যাতে করে আমি বুঝ্‌তে পারি যে, আমাদের দুয়ের মাঝে জীবনের এমন একটা আগাগোড়া কাহিনী আছে, যা এ দুয়ের মাঝে যে মহাশূন্যতা রয়েছে, তা ভরে দিতে পারে। সে কাহিনী শাশ্বত। আর মনে হচ্ছে যে অনুসরণ করাই বোধ হয় যথার্থ স্মৃতি রক্ষা। এ জিনিষটা ভালবাসার ও শ্রদ্ধার কষ্টি-পাথর। আরও একটা কথা ভাব্‌ছি কদিন, এবং তাতে যেন একটু শান্তিও পাচ্ছি। কথাটা কি জান ? কথাটা, দুঃখের মজুরী সবটাই দিতে হয়। এতে কাট্‌তে গেলে তার কাজ আর ফুরোবে না। সে যখন তার দিনমজুরীর সব পয়সা দিয়ে যাবে, তখনই তার ছুটী। তাই দেখে কতকটা যেন চোখ খুল্‌ছে। ওই পাহাড়ের দুঃখ আমার চাইতে অনেক গভীর, আর অনেক বেশী দিনের—তার দুঃখ যুগযুগান্তের। কিন্তু সে বড় আমার চাইতে। নীরব হয়ে এ যেন বল্‌তে চায়, 'সান্ত্বনা দিতে যেয়ো না, উথ্‌লে উঠ্‌বে। শুধু দূর থেকে দেখ। তবে তুমি নিজে আমারই মত অনুভব কর্‌বে, কিন্তু সে অনুভূতির ভাষা থাকবে না। দেখ্‌ছনা আমার ভাষা নেই !" বলে দেবে কথাটা খাঁটী কি না ?

হক্‌কথা

(নাটিকা)

(শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র নাগ)

প্রথম দৃশ্য

[হবোহবো গ্রাজুয়েট এবং তাহার ভবিষ্যৎ।
অবস্থা—উদাস।
বেশ—এলোমেলো অথচ রুচিকর।]

ভায়া,
বি, এ, পড়ে হঠাৎ যেন প্রাণ্‌টা রসাল
হল বেশ।
ভায়া—(কারণ বি, এ, পড়লে প্রজাপতি
করেন বিয়ের আর্জ্জি পেশ।)
এখন—ক্লাসের মাঝে ঢুক্‌লে পরে
বিরহে প্রাণ কেঁদে মরে

মন্‌টা যে ভাই উধাও হয়ে
যেতে চায় কোন্ অচিন্ দেশ।
তার উপরে ভবিষ্যতে
ভেব না ভাই,—ভাব্‌লে ফতে ;
হব একটা যা কিছু হ'ক
এ নেশাটাও আছে বেশ।

ভায়া— ... ... (তা'ত অবশ্যই)
এখন চল্‌লে পথে পেখম ধরে
(ভাবী) শ্বশুর মশায় আদর করে
বলেন, 'বাবা, সুবোধ ছেলে
থাকা তোমার কোথায় হয় ?
কোথা হ'তে হচ্ছে আসা
(চেহারা ত বেজায় খাসা)
লক্ষ্মী তোমার নামটি বা কি—?
এস সঙ্গে, কিসের ভয় ?
আছে—কন্যা আমার বিদ্যাবতী
গান বাজ্‌নাতে বেজায় মতি
তার উপরে রূপ্‌টি বাপু—
তা' থাক্‌ দেখেই নিও—
চাই না আমি দিতে ক্লেশ।
কিন্তু বাছা বল্‌ছি সত্য
দেখ্‌লে চম্‌কে যাবে পিত্ত
চাই কি হলেও হতে পারে
দিব্য একটু প্রেমাবেশ।
তার উপরে বিষয় আশয়
মোটেই আমার সেকেলে নয়,
এতেও তোমার নাই কোন ভয়
শুনছ বাছা, কিসের লাজ ?
তুমি ত বাপ্‌ লক্ষ্মী ছেলে
পরের দুঃখে যাও যে গ'লে
বিমুখ ক'রে মাথায় আমার—
মারবে কি আজ নিঠুর বাজ ?
জুতা মোজা ঘড়ি চেন্‌
দিব—সাইকেল্‌, ষ্টাইলো পেন্‌
অধিকন্তু তার উপরে —
করব রাঙ্গা কন্যা দান।
এস বাবা, লক্ষ্মী ছেলে
রাখ আমার কুলের মান।'
ভায়া—(বাঃ বাঃ ক্যায়া মজা, তার পুরেতে ?)
আরে—এম্‌নি যখন ধরেন শ্বশুর—
ভদ্রতায় কি কর্‌ব কসুর ?
তা' হলে যে বর্ব্বরতা
প্রমাণ হবে নিঃসংশয়।
ভায়া— ... (তাত কাজেই ভায়া)
তার উপর এই নবীন বয়স,
আদি রসে বেজায় সরস
এক্‌টু—আধটু—কিউরাসিটি—
এমন কালে সবার হয়।
যখন—প্রাণের টানেই প্রাণ চলেছে
কিসের এত লোকের ভয়।
ভায়া— ... ... (তাত বটেই বটে)
এম্‌নি ভাবে যখন ভায়া
হাটে ঘাটে সমাদর—
তখন—অবশ্যই বুঝ্‌তে হবে
বাড়ছে মোদের বেজায় দর।
তাই বলি ভাই বি, এ, পড়ে
প্রাণটা রসাল হ'ল বেশ।
ভাবদরিয়ায় বান্‌ ডেকেছে—
ঘুচে গেছে সকল ক্লেশ।
ভায়া— ... তা' বেশ বলেছ, বেশ বলেছ
ওগো আমার লক্ষ্মীচাঁদ
(আজ কাল) বি, এ, পড়া অবশ্যই—
ক'নে ধরার সহজ ফাঁদ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[বিবাহিত গ্রাজুয়েট, এবং তাহার আসবাব।
অবস্থা—আনন্দে আত্মহারা।
বেশ—অতীব পরিপাটি।]

ভায়া, কেয়া বেমালুম্ *
এই বিয়ে করে প্রাণের মাঝে
লেগে গেছে প্রেমের ধুম্।
ভায়া— ... ... (সত্যি নাকি ?)
এখন—আসে ধীরে চক্ষু বুঁজে
মনটা প্রায়ই পাইনা খুঁজে
আবার—খুঁজ্‌লে প'রে চুরির দায়ে
ধরা পড়ে রাঙ্গা বউ।
ভায়া—ধর, ধর, ভেসে গেলাম
লাগ্‌ল বুঝি প্রেমের ঢেউ।
ভায়া— ... ... (না না, সাম্‌লে গেছ)
আহা, কি যেন এক ভাবের ঘোরে
জীবনটা বেশ্ গেছে পু'রে
ভাবি যেন ধরার মাঝে
বইছে শুধু মলয় বায়।
ভায়া— ... ... (হায় রে হায়)
এখন—গদ্যকেও পদ্যে পড়ি,
আঁধার রাতেও জ্যোৎস্না হেরি
কি যেন কি হ'য়ে গেছি
বুঝ্‌তে নাহি পারি তায়।
ভায়া— ... ... (এমন সবারই হয়)
ফুটলে প্রসূন বইলে মলয়
সব হয়ে যায় কবিত্বময়
বসন্তানিল লাগ্‌লে গায়ে
কি যেন কি হয়ে রই।
ভায়া— ... ... (বেজায় দেখি)

যখন ভায়া কোকিল ডাকে
চিত্ত কি আর স্ববশ থাকে?
জেগে জেগে স্বপন দেখে
আপন ভুলে বিভোর হই!
ভায়া— ... ... (ভায়া, ঠেক্‌বে পা:)
(তুমি) বুঝ্‌বে কি আর সাদা প্রাণে
সুখ মিলে না মিলন বিনে
প্রেম যদি চাও, আপন বিলাও
হের্‌বে ধরা হাস্যময়।
ভায়া— ... ... (সত্যি নাকি ?)
(তখন) স্বপন রাজ্যের ভাবের রাশি
আপ্‌নি চো'খে উঠ্‌বে ভাসি'
বুঝবে, তখন কি আনন্দ
সদাই প্রাণে লেগে রয়।
ভায়া— ... ... (আমার কপাল মন্দ)
ভায়া, করবে যা' তা শীঘ্র কর—
প্রেমসাগরে নেমে পর
যাচ্ছে সময়, পাল খাটিয়ে
চলে যাও উজান বে'য়ে।
ভায়া— ... ... (তা যুক্তি ভাল)
ক'দিনের বা তুচ্ছ জীবন
বিলম্বের আর নাই প্রয়োজন
পে'লে যদি মানব জীবন
যাবে কি তা এম্‌নি বয়ে।
ভায়া— ... ... (দাঁড়াও আসি)

তৃতীয় দৃশ্য

[বিবাহিত গ্রাজুয়েট এবং তার অবস্থা।

অবস্থা—অতি বিমর্ষ।

বেশ—জরাজীর্ণ ও মলিন।]

ভায়া, হ'লো কি ব্যাপার!
সাধের 'তুনিয়াদারি' যতই হেরি
ততই ঘনায় অন্ধকার।
ভায়া— ... ... (তা, একটু ঘনায় বটে)
ছিল যা' রঙ্গিন আশা,
নাই ভায়া আর—তুল্ছে বাসা
শুধু নিরাশা আজ হৃদয় পূ'রে
উঠায় করুণ হাহাকার।
ভায়া— ... ... (বলি, দোষটা কাহার।)
জীবনের যত পদ্য
হয়ে গেছে নিছক গদ্য
রঙ্গ-বেরঙ্গের ভাবগুলি মোর
হল যে সব একাকার।
(এখন) পেছন্ দেশে বিজন বিপিন
সম্মুখে ভীম পারাবার॥
ভায়া— ... ... (খাও হাবুডুবু)
নি'বে গেছে চোখের আলো
তাই হেরি সব বেজায় কালো
অতীতের সে দিনগুলি আজ
স্বপন ব'লে মনে হয়।
ভায়া— ... ... (তা'ত হবেই ভায়া)
সেই আনন্দ সুধারাশি
নির্ভাবনার অট্টহাসি
বিফলতার তপ্ত শ্বাসে
পু'ড়ে হ'য়ে গেছে ক্ষয়।
ভায়া— ... ... (কপাল দোষে)
এখন—রাত্রি দিবা সকাল সাঁঝে
নিত্য নবীন ব্যথা বাজে
দুঃখ দৈন্য, অবিচ্ছিন্ন
ঘটায় মরণ অন্ধকার।

(যত) প্রাণের সাথী ধরম ভুলে
আপন নি'য়ে গেছে চ'লে
সবার হেয়, নিঃস্ব আমি
বইছি শুধু জীবন ভার।
ভায়া— ... ... (আহা, বড়ই করুণ)
এখন—বল্লে দু'টো প্রেমের কথা
গিন্নির অম্নি ধরে মাথা
কোমল প্রাণে পে'য়ে ব্যথা
করেন সঙ্গীন্ অভিনয়।
বলেন—ছি, ছি, লাজে মরি
জুটে নাকি গলায় দড়ি —
উপার্জ্জনে অষ্টরম্ভা
বচন-বাগীশ মহাশয়!
দারা পুত্র অভুক্ত যার
প্রেম করা ত সাজে না তার,
ছি, ছি, তোমার হল একি
স'য় না যে গো জ্বালা আর।
একি তোমার নিলাজ নিঠুর
সৃষ্টি ছাড়া ব্যবহার।
ভায়া— ... ... (একটু সঙ্গীন্ বটে)
ভায়া, কিসের দারা পুত্র কন্যা
'কা কস্য পরিবেদনা'
যতই দিবে ততই হাসি—
ততই ভালবাসাবাসি,
নইলে ভায়া 'হাঁড়িপানা'
মুখের চোটে টেকা ভার।
এম্নি ভাবে স্বার্থে ভরা
দারা পুত্র পরিবার।
ভায়া— ... ... (ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর)

(যবনিকা)

ঢাকার শঙ্খশিল্প

(শ্রীকুমুদরঞ্জন চৌধুরী)

আমাদের দেশের যে সকল সুকুমার শিল্প অবাধ বাণিজ্যে বিদেশী কলের সহিত প্রতিযোগিতায় টিঁকিয়া থাকিতে না পারিয়া কালক্রমে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা নেহাৎ কম নহে; যেগুলি আজ পর্য্যন্ত সজীব রহিয়াছে, নানাকারণে সেগুলির মধ্যেও শৈথিল্য ও জড়তা প্রবেশ করিয়াছে। কালের স্রোতের সহিত ইহাদের উন্নতির এবং পরিবর্ত্তনের বিষমতা হওয়ায়, ইহাদের অবস্থা বহুকাল পূর্ব্বে যেরূপ ছিল বর্ত্তমানেও অল্পবিস্তর সেরূপই রহিয়া গিয়াছে; এবং নবযুগের যে পরিবর্ত্তন-প্রবাহ ইহাদিগকে নিত্য নূতন উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিত, তাহাই এখন রুদ্ধস্রোতের সঞ্চিত বেগ লইয়া ইহাদিগকে আঘাত করিতেছে। ঢাকার 'শঙ্খশিল্প' ইহাদেরই একটি।

আমাদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহে, দেবপূজায় এবং বিবাহ প্রভৃতি মাঙ্গলিক কর্ম্মে শঙ্খের ব্যবহার অতি প্রাচীন। বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয়েই শঙ্খকে পবিত্র ও মঙ্গল অনুষ্ঠানে অত্যাজ্য মনে করেন। হয়ত বা এইজন্যই, শাঁখা-সিঁদূর বিবাহিত হিন্দুমহিলার একটি নিত্যাবশ্যক প্রসাধন পদার্থে পরিণত হইয়াছে। চীনদেশে এবং তিব্বতেও শঙ্খ এরূপ পবিত্র ও মূল্যবান্ দ্রব্য। শাঁখা বাংলাদেশের অনেক স্থানেই প্রস্তুত হইয়া থাকে; কিন্তু ঢাকার শাঁখা বিচিত্রতা, সূক্ষ্মতা, কারুকার্য্য ও সকল রকমের শিল্পচাতুর্য্যে অদ্বিতীয়। বর্ত্তমানে ঢাকার এই গৃহ-শিল্পটির অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে অচিরে ইহার উন্নতি বা সংস্কার সাধন না করিলে ঢাকার শিল্প নিশ্চিত লুপ্ত হইয়া যাইবে।

অধুনা বিলুপ্ত অন্যান্য গৃহশিল্পের ইতিহাসের ন্যায় শঙ্খশিল্পের ইতিহাসও শিল্প-বাণিজ্যের উপর দেশ-কালের প্রভাব প্রতিপন্ন করে। কেবল মাত্র কালের খেয়ালে ও লোকের হুজুগে কোন দেশের শিল্প-বাণিজ্য গঠিত হইয়া উঠিতে পারে না; স্বদেশীয় যুগের উৎসাহ ও উদ্দীপনাই যদি আর্থিক শিক্ষা ও সাধনার অভাবেও আমাদিগকে গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা দিত, তাহা হইলে হয়ত আজ আমাদের আর্থিক সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া যাইত। সকল শিল্প ও ব্যবসায়ের সংগঠনে দেশকালের মাহাত্ম্য, জাতীয়তা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রভাব, এবং নৈতিক ও সামাজিক আদর্শের চিহ্ন স্পষ্টরেখায় মুদ্রিত হইয়া উঠে। এইজন্যই আমাদের গৃহশিল্পগুলির অবস্থা বিশ্লেষণে অনেক বিরুদ্ধ শক্তির ক্রিয়া লক্ষিত হয়; এবং কোনও একটি বিশেষ শক্তির প্রভাব লক্ষ্য করিতে হইলে নানাক্ষেত্রে ইহার নানা পরিণাম পরীক্ষা করিতে হয়। অল্প কথায়,

একের মধ্যে যেরূপ বহুর প্রভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সেরূপ বহুর মধ্যেও একের সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। শিল্পবাণিজ্যের এই আপেক্ষিকতার আলোচনায় অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'ভারতবর্ষের আর্থিক জীবনের ভিত্তি' নামক গ্রন্থের (Foundations of Indian Economics) ভূমিকায় লিখিয়াছেন ঃ—

আমাদের প্রধান কুটীরশিল্প ও পল্লীশিল্পগুলির অবস্থার স্বতন্ত্র পরীক্ষা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, যে সকল শিল্প এখনও সতেজ রহিয়াছে এবং প্রভূত প্রাণশক্তির পরিচয় দিতেছে, তাহাদের সব কয়টিই পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত মিলিত ও সুসঙ্গত হইয়া আছে। শেষ পর্য্যন্ত, সবগুলির সংরক্ষণে নৈতিক নিয়ম ও আদর্শের ক্ষমতা অটুট রহিয়াছে। (অনুবাদ)

একটি উদাহরণ লইলেই বক্তব্য কথা স্পষ্ট হইবে। য়ুরোপের প্রধান দেশগুলিতে মধ্যযুগের আর্থিক অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিয়া শিল্পে ও বাণিজ্যে একটি যুগান্তরের সূচনা হইয়া গিয়াছে ; তাহাদের শিল্পপ্রথায় ও জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ পদ্ধতিতে কলের প্রভাবে বিপ্লব ঘটিয়া অভাবনীয় পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু ইংল্যাণ্ড অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় ফরাসী দেশেও কলের প্রচলন, কারখানা-প্রতিষ্ঠা ও শ্রমজীবি-সমস্যা কেন ব্যাপক ও জটিল হইয়া উঠিল না ?—ফরাসীদেশের ইতিহাসের সহিত যাহাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ, তাঁহারা জানেন যে, মধ্য যুগে ফরাসী রাষ্ট্রীয় জীবনে ঐক্য ও সাম্য ছিল না ; দেশের বিভিন্ন অংশে তখনও অন্তর্বিপ্লবের অগ্নি নির্বাপিত হয় নাই, মধ্যবিত্ত শ্রেণীয় লোকের অভাবে শিল্পদ্রব্যে একদিকে যেমন সাধারণ সুলভ স্থানীয় উৎপন্নের আধিক্য ছিল, অন্য-দিকে তেমনই সূক্ষ্ম কারুকার্য্যসম্পন্ন বহুমূল্য দ্রব্যের প্রাধান্য ছিল ; রেলপথগুলির গঠন প্রণালী বাণিজ্যের অনুকূল ছিল না ; এবং ফরাসী বিপ্লবের সাম্যবাদের তরঙ্গে যেমন আর্থিক উন্নতির অন্তরায় কতকটা দূর হইল, তেমনই পিতার সম্পত্তিতে সকল পুত্রের সমান উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সাধারণ লোকের ব্যয়সাধ্য যন্ত্র-প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা কমিয়া গেল। এইজন্য ফরাসীদের প্রাধান্য ও নেতৃত্ব ঠিক সেই-সকল শিল্পে, যে-গুলিতে অল্পব্যয়ে, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে অতি চমৎকার কারুকার্য্যপূর্ণ দ্রব্য প্রস্তুত হয়। মোগল আমলে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা কতকটা এরূপ ছিল ; আমাদের শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থাও যে প্রায় এরূপ ছিল, তাহা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তির অবিদিত নহে। বর্ত্তমানে মধ্যবিত্ত লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হওয়াতে আমাদের শিল্পদ্রব্যে ও বাণিজ্যদ্রব্যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে ; ইহা সকলেরই দৃষ্টিগোচর।

শঙ্খশিল্পের প্রথম প্রতিষ্ঠা দাক্ষিণাত্যে হইয়াছিল। ভারতবর্ষের শঙ্খের আকর মান্দ্রাজ, সিংহল ও বোম্বের উপকূলের নিকট। আকরিকগণের শঙ্খ তুলিবার পাঁচটি ক্ষেত্র আছে। মান্দ্রাজ উপকূলে টুটিকোরিন্ নামক স্থান হইতে সর্ব্বোত্তম শঙ্খ বাংলায় আসে। রামনাদ ও তাঞ্জোর হইতেও শঙ্খ পাওয়া যায় কিন্তু তাহা প্রথমোক্ত শঙ্খের মত উৎকৃষ্ট নহে। মান্দ্রাজ-

উপকূলের এই সকল স্থান ছাড়াও সুরাটের নিকট হইতে ও সিংহলের উত্তর কূল হইতে বাংলায় শঙ্খ আমদানি হইয়া থাকে। অতি প্রাচীন কালে মান্দ্রাজের পূর্ব্বাঞ্চলে, মহীশূর ও হায়দ্রাবাদের সান্নিধ্যে এবং গুজরাটে শঙ্খশিল্প প্রতিষ্ঠিত ছিল। কাঁচা মাল নিকটে ও সুবিধামত পাওয়ায় শঙ্খশিল্পের প্রথম প্রতিষ্ঠা দাক্ষিণাত্যে সম্ভব হইয়াছিল; উপরন্তু দ্রাবিড় ভাস্করগণের অসামান্য নিপুনতাও ইহার কারণ। ইতিহাসে ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠা ও স্থান নির্ণয়ের আলোচনায় শিল্পের প্রবর্ত্তনে দেশমাহাত্ম্য দৃষ্ট হয়।

১৯২৪ সনের ফেব্রুয়ারী মাসের 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রিকায় শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র দত্ত প্রাচীন শঙ্খশিল্প সম্বন্ধে আলোচনাকালে লিখিয়াছেন:—

পুরাতত্ত্বের হিসাবে এবং পুরাতন লেখা ও ভ্রমণ-কাহিনী দেখিয়া বলিতে গেলে, আমরা খ্রীষ্টীয় যুগের প্রথম শতাব্দী পর্য্যন্ত শঙ্খশিল্পের অস্তিত্বের নিদর্শন পাই। ... ... বাংলার এসিয়াটিক সোসাইটীর লিপিমালায় মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের মুক্তা ও শঙ্খের ফিসারি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ হর্ণেল সাহেব দাক্ষিণাত্যের শঙ্খব্যবসায়ের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে মূল তামিল হইতে কতকগুলি কৌতূহলপ্রদ অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যে হিন্দুরাজত্বের সময় এই শিল্পের অবস্থা অতি উন্নত ছিল। ... ... কালক্রমে দক্ষিণ দেশে হিন্দু প্রাধান্যের লোপ হইলে, শিল্প-বাণিজ্যের শৃঙ্খলায় বিপর্য্যয় ঘটে; এবং সম্ভবতঃ তখনই দাক্ষিণাত্যে এই শিল্প বিলুপ্ত হয়। হর্ণেল সাহেবের মতে, শঙ্খব্যবসায়ের বাংলাদেশে স্থানান্তরের প্রমাণ মালিক কাফুরের বাংলা আক্রমনের সময় পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার পূর্ব্ববর্ত্তন বাংলা-সাহিত্যেও বাংলা দেশে শঙ্খের আমদানি ও শাঁখার ব্যবহার প্রমাণিত হয়। দশম শতাব্দীতে রমাই পণ্ডিতের লেখায় বিবাহকালে আত্মার রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে ইহার উল্লেখ আছে। ... ... চণ্ডীদাসের কাব্যে ক্ষীণ চন্দ্রের সহিত হাতের শাঁখার তুলনা আছে—

কিবা সে ভুগুলি শঙ্খ ঝলমলি
সরু সরু শশিকলা। ... ... (অনুবাদ)

এই লেখা হইতেই, রাষ্ট্রিয় শক্তির পরিণতিতে ও স্থানান্তরে ব্যবসায়ের যে পরিবর্ত্তন ও বিশৃঙ্খলা হয় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইতিহাসে উভয় দিকে যে রূপান্তর হয় তাহা প্রায়ই এক কারণাধীন। রাষ্ট্রশক্তি ও ধনবল নাড়ীর বন্ধনে পরস্পর সংযুক্ত; সামাজিক প্রাধান্যের এবং ধনপ্রাধান্যের ভারকেন্দ্র প্রায়ই একত্র দেখা যায়। শঙ্খশিল্পের ইতিহাসে এই কথাটি খুব স্পষ্ট করিয়া প্রমাণ করে। মোগল রাজত্বে টেভার্ণিয়ার তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে ঢাকায় ও পাবনায় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিস্তৃত শঙ্খ-ব্যবসায়ের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। তখন হইতেই ঢাকা হইতে তিব্বত, ভূটান, শ্যামদেশ, আসাম ও বিহারে প্রচুর পরিমাণে শাঁখা রপ্তানি হইত। মান্দ্রাজ হইতে সে সময় অবাধে বাংলায় আমদানি হইত।

মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পূর্ব্বেই আমাদের সামুদ্রিক ও উপকূলবর্ত্তী বাণিজ্যে বিদেশীয়গণের অধিকার ও কর্তৃত্ব প্রবল হয়। মান্দ্রাজে ওলন্দাজ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার পরে শঙ্খ রপ্তানির ব্যবসায় কোম্পানীর একায়ত্ত (Monopoly) হইয়া পড়ে। সেই সময় হইতেই শঙ্খ-বাণিজ্যে শঙ্খ রপ্তানির একায়ত্ত অধিকার বিদ্যমান। মান্দ্রাজের বর্ত্তমান প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট এ বিষয়ে সেই ওলন্দাজ কোম্পানীর স্থলবর্ত্তী মাত্র, এবং তাহাদেরই মত, যে সর্ব্বাধিক মূল্য দিতে প্রস্তুত, তাহার নিকট চুক্তি করিয়া শঙ্খের আকর বিক্রয় করেন। ইহাতে শঙ্খের ব্যবসায়ে সঙ্গতিপন্ন মধ্যবর্ত্তিগণের প্রভাব অতিশয় বর্দ্ধিত হওয়ায় এই শিল্পে একটি অস্বাস্থ্যকর অস্থিরতা প্রবেশ করিয়াছে। শিল্পের এই একটি আধুনিক দুর্ব্বলতার মূল মান্দ্রাজের প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের সংগঠনবৃত্তান্তের সহিত অচ্ছেদ্য সূত্রে জড়িত; এবং বাংলায় শঙ্খ আমদানীর ব্যবসায়ে একায়ত্ত অধিকার রাষ্ট্রশক্তির হস্তান্তরে বিদেশীয়দের বাণিজ্যনীতিকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। কতকটা এইজন্য এবং কতকটা শাঁখার পরিবর্ত্তে ব্যবহার্য্য অন্য প্রকার চুড়ি বাহির হওয়ায় শঙ্খশিল্পে ভাঁটার স্রোত বহিতেছে। বাংলাদেশে স্বদেশীয় যুগ আসিলে পল্লীশিল্পের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল এবং চারিদিকেই অবস্থার উন্নতি সাধনে উৎসাহ ও ব্যগ্রতার অবধি রহিল না। সে-যুগের কবি বিদেশী বস্ত্র পরিহারের সংকল্প করিয়া গাহিলেন—

'ওমা ভূষণ বলে' পরব না আর তোমার গলার ফাঁসি,
(আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি)।

বিদেশী কাচের চুড়ি ত্যাগ করিবার চেষ্টায় এবং সঙ্গে সঙ্গে শাঁখার নব নব পরিকল্পনায় ও মনোহারিতায় আমাদের রুচির পরিবর্ত্তন হইল। এই শিল্পে আবার উদ্যম সঞ্চার হইল। কিন্তু তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না, সময়ের দ্রুত পরিবর্ত্তনে উৎসাহ নিবিয়া আসিল। শঙ্খের সংগ্রহ অল্প হওয়ায় তাহার মূল্য বাড়িয়া গেল, দ্রব্যাদির মহার্ঘতায় শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি হইল, নির্দ্দিষ্ট আয় বিশিষ্ট ক্রেতাদের আর্থিক অবস্থা হীন হইয়া পড়িল; এবং তদুপরি বাজারে লাক্ষানির্ম্মিত 'রেশমী চুড়ির' খুব কাট্তি হইল। এই সকল কারণে শঙ্খকারদের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়ায়, তাহাদের কর্ম্মক্ষমতার ও দক্ষতার হ্রাস হওয়ায়, তাহারা প্রতিদিন দারিদ্র্যের সোপানে ক্রমেই অবতীর্ণ হইতে লাগিল।

ভিতরের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিলে ও প্রকৃত অবস্থার তাৎপর্য্য বুঝিলে, স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে শীঘ্র কোনরূপ সংস্কার না করিলে এই শিল্পটি টিঁকিবে না। প্রথমই চোখে পড়ে শাঁখারি বাজারের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া ও জনাকীর্ণতা। অল্প পরিসর স্থানের মধ্যে প্রায় সহস্র লোকের বাস; একটি মাত্র প্রবেশ পথ, তাহাও অপ্রশস্ত ও অপরিচ্ছন্ন; দুই দিকের আবর্জ্জনা ও জঞ্জাল নর্দ্দমার মধ্যে আট্কা পড়িয়া পূতিগন্ধময় হইয়া উঠিয়াছে। দুইদিকের

ঘরগুলি অপ্রশস্ত, কোঠাগুলি স্বল্পালোকিত; দুর্দ্দিনে মারী-ভয়ের ছায়া এই নিরানন্দ কক্ষগুলিতেই প্রথমে ঘনাইয়া উঠে। শহরের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা এখানে মৃত্যুর হার অনেক বেশী, চিকিৎসার অভাবে প্রায় বৎসরই শতকরা অন্যূন ১৫ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কলের জলের অপ্রাচুর্য্যে এবং বাড়ী নির্ম্মাণের স্থানাভাবে শঙ্খকারদের স্বাস্থ্যসমস্যা জটিল হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের সহিত অন্যস্থানের শাঁখারিদের বিবাহ বন্ধন নাই; ইহারা নিজেদের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ সীমাবদ্ধ করিয়া আপনাদিগকে একটি স্বতন্ত্র শ্রমিক-সংঘে (Trade guild) পরিণত করিয়াছে। শাঁখারিদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন অধিক নহে; অজ্ঞানের জড়তা ও সংস্কারের সঙ্কীর্ণতার জন্য উন্নতির বহু পথ ইহাদের নিকট রুদ্ধ। নিজের বর্ত্তমান অবস্থায় অসুবিধা, অভাব ও অসন্তোষ-বুদ্ধি লুপ্ত হওয়ায় অনেক অসঙ্গতি অন্ধসংস্কারের ন্যায় গা-সহা হইয়া গিয়াছে। শিক্ষার তাড়িতস্পর্শে যেদিন ইহাদের চেতনায় অভাবের বেদনা তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিবে, সেদিন শঙ্খশিল্পের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইবে। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে উপায়ে শঙ্খ কাটা হইত, বর্ত্তমানে শাঁখারি বাজারে প্রায় সেইরূপই হইয়া থাকে। অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় নাই দেখিয়া, মনে হয়, কোনও মন্ত্রকুহকে এখানে কালের প্রবাহ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। শিক্ষার বিস্তৃতি হইলেই উৎসাহ ও অধ্যবসায় নূতন বন্যার ন্যায় উচ্ছলিত হইয়া উঠিবে—তখন এই পুরাতনের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া গিয়া চারিদিকে নূতন সৃষ্টির সাড়া পড়িবে।

শ্রমজীবিগণের কাজের প্রতি মনোযোগ করিলেই দেখা যায় তাঁহাদের কাজ তিনভাগে বিভক্ত এবং তিনটি অংশে ভিন্ন রকমের কুশলতা আবশ্যক :—প্রথম, গোটা শঙ্খটাকে ছোট ছোট চাকার মত করিয়া কাটা; দ্বিতীয়, এই চাকাগুলির ভিতর ও বাহিরের দিক ঘষিয়া সমান করা; এবং সর্ব্বশেষ তাহার উপর নানাবিধ বিচিত্র রেখা অঙ্কিত করিয়া এবং স্থানে স্থানে রঙ্ লাগাইয়া পরিকল্পিত করা। প্রথম শঙ্খকাটার কার্য্যই অতি শ্রমসাধ্য, তাই লোকের অভাব এই কার্য্যেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। একখানা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি করাতের দুই কোণায় ধরিয়া ডানে বাঁয়ে ঘষিয়া পদতলের মধ্যে দৃঢ়-ধৃত শঙ্খকে খণ্ড খণ্ড করিয়া চক্রাকারে কাটিতে হয়। এই রকম করাত চালনা করা শ্রান্তিজনক; অধিকন্তু ইহাতে বিশেষ নিপুণতা আবশ্যক; কিন্তু ক্রমাগত অধিক সময় কাজ করিলে এত গুরুতর স্নায়বিক অবসাদ আসে এবং একটু অসাবধান হইলে কার্য্য নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা এত বেশী যে, ইঁহারা অধিকক্ষণ কাজ করিতে পারে না; এবং প্রথম প্রথম নূতন উদ্যমে কাজ আরম্ভ করিলেও অতি বড় শ্রমসহিষ্ণু ব্যক্তিও শেষ পর্য্যন্ত আপনার দক্ষতা ও কার্য্যক্ষমতা রক্ষা করিতে পারে না। এই সকল শ্রমজীবিদের মধ্যে শতকরা ২৫ জন শিল্পী নিজে দোকানদার এবং অবশিষ্ট প্রায় ৭৫ জনই মজুর মাত্র। ঢাকার এই শ্রেণীর শ্রমিকের মধ্যে শতকরা প্রায় ৬৫ জনই ঢাকার অধিবাসী নহে, ইহারা

কৃষ্ণনগর, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া প্রভৃতি স্থান হইতে আগত। কৃষ্ণনগরেও শাঁখা প্রস্তুত হয়; কিন্তু তাহা ঢাকার ন্যায় এত সুন্দর ও সরু নহে। ডাক্তার রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থে ইহার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ দুই রকম শাঁখার সেদিকে ব্যবহার দেখা যায়—কর্দ্দ ও খিতেন। প্রথমোক্ত শাঁখা একটা শঙ্খের কোণা কাটিয়া ও পালিশ করিয়া প্রস্তুত হয়। ইহা দেখিতে বিশেষ মনোজ্ঞ হয় না; কিন্তু কৃষক এবং অন্যান্য লোকেরা উহা খুব কিনিয়া থাকে। শেষোক্ত শাঁখা বৃত্তার্দ্ধের ন্যায় বাঁকা দুইখানি শাঁখার টুকরাকে একত্র জোড়া দিয়া তৈয়ার হয় এবং দেখিতে পূর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর হয়—সাধারণ লোকে ইহা বেশ কিনিয়া থাকে। কিন্তু এর কোনটিকেই ঢাকার শিল্পের সহিত একত্র তুলনা করা চলে না। ঢাকার এই শ্রেণীর শ্রমিকের মধ্যে ভিন্ন স্থানের অধিবাসীর আধিক্য হওয়ায় মজুরি নির্দ্ধারণে আগন্তুকদের প্রভাব অধিক। উহারা মহাজনের নিকট হইতে দাদন লইয়া শঙ্খ কাটিয়া দেয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে তাহাদের মজুরি প্রতি শতশঙ্খে প্রায় দশ টাকা ছিল, বর্ত্তমানে প্রায় পঁচিশ টাকা হইয়াছে। যাহারা অসাধারণ কর্ম্মকুশল, তাহাদের মজুরি ৩৫৲ হইতে ৪৫৲ পর্য্যন্তও আছে। যুদ্ধের পরে শঙ্খের দাম প্রায় আড়াই গুণ বাড়িয়াছে; ঢাকার অধিবাসী যে সকল মজুরেরা কাটা শাঁখার উপর কারুকার্য্য ও রঙ্ করে, তাহাদের মজুরি সওয়া গুণ বাড়িয়াছে; যাহারা শঙ্খ কাটে তাহাদের আয় প্রায় আড়াইগুণ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত মজুরের তুলনায় দ্বিগুণ মজুরী বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহাতেই বোঝা যায় যে, কেবল মাত্র জিনিষ পত্রের দুর্ম্মূল্যতা এই মজুরি বৃদ্ধির কারণ হইলে উভয় কার্য্যে সমান অনুপাতে আয় বাড়িত। উপরে যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট প্রমান হইতেছে, শঙ্খকাটার কাজে যে সকল শ্রমিক ঢাকায় নিযুক্ত আছে, তাহাদের অধিকাংশের বাড়ী ঢাকায় না হওয়ায়, ঢাকায় কাজের অনটন হইলে, তাহাদের আপন গৃহে গিয়া কাজ পাওয়ার সুবিধা আছে বলিয়া এবং সর্ব্বোপরি এই শঙ্খ কাটার কার্য্যটি অত্যন্ত শ্রমসাধ্য বলিয়া এবং অধিকদিন এরূপে কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে কার্য্যদক্ষতা নষ্ট হইয়া আসে বলিয়া, মজুরের অভাব বশতঃ শঙ্খকাটার কার্য্যে মজুরিবৃদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছে। আর এদিকে, ঢাকার অধিবাসী যে সকল শ্রমিক, কাটা-শাঁখার উপরে কারুকার্য্য এবং রং করে, তাহাদের প্রকৃত আয় (Real income) দ্রব্যাদির দুর্ম্মূল্যতায় কমিয়া গেলেও সংস্কার বশতঃ অন্য ব্যবসায়ে বা শিল্পান্তরে চলিয়া যাইবার প্রবৃত্তি না থাকায়, তাহাদের কাজে কর্ম্ম-প্রার্থীর প্রাচুর্য্য থাকায়, জিনিষ পত্রের মহার্ঘ্যতার অনুপাতে তাহাদের আয়বৃদ্ধি হয় নাই। শিল্প হইতে শিল্পান্তরে সঞ্চরণ ক্ষমতা থাকিলে, অথবা স্থানান্তরে চলিয়া যাইবার সুবিধা থাকিলে, কোথাও শ্রমিকদের অবস্থা হীন হইলে অন্যত্র চলিয়া গিয়া দুরবস্থার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু সেরূপ সুবিধা না থাকিলে মজুরি যে কম হইবে তাহার প্রমান এখানেই পাওয়া যায়। ইহাদের ব্যয়ের হিসাব দেখিলে প্রকৃত অবস্থা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে। প্রাণপাত করিয়া, অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যে ছয় সাত ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া যাহা উপায় হয়, তাহার

কি পরিমাণ নিত্য আবশ্যক দ্রব্যের জন্য ব্যয় করিতে হয়, এবং বাকী কি পরিমাণ ভবিষ্যতের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অবশিষ্ট থাকে, তাহা দেখিলে শ্রমিকের জীবনের বাস্তব চেহারা আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে একটীবারের জন্য ফুটিয়া উঠিয়া আমাদের সুপ্ত চেতনাকে আঘাত করিয়া যায়। বাস্তবিক তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। প্রতি পরিবারে গড়ে ৫ জন লোক; হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, তাহার মধ্যে দুইজন বয়স্থ ব্যক্তি ও একটি বালক উপায়শীল, এবং বাকী লোকের মধ্যে একজন পোষ্য। স্ত্রীলোকের গৃহকর্ম্মের মূল্য হিসাব না করিয়া এই আনুমানিক পরিবারের মোট আয় মাসিক ৬৫৲ টাকায় গিয়া দাঁড়ায়; তাহার মধ্যে প্রায় ৫২৲ টাকাই অর্থাৎ মোট আয়ের শতাংশের ৮১ অংশই আহার্য্যে ব্যয় হয়, ১৫ অংশ পরিধেয় ও বাড়ীভাড়ায় খরচ হয় এবং বাকী চারি ভাগ ট্যাক্স ও অন্যান্য আবশ্যক কার্য্যে ব্যয়িত হয়। হাতে কিছুই বাকী থাকে না; দাদনের ঋণ শোধ করিতে প্রায়ই কাজ করিয়া কুলান যায় না, নূতন করিয়া ঋণ করিতে হয়। স্বাস্থ্যকর আমোদ প্রমোদের কথা ছাড়িয়া দিলেও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা এবং ভবিষ্যতের দুর্দ্দিনের জন্য ব্যবস্থা করিবার কিছুই হাতে অবশিষ্ট থাকে না। অধিকাংশ লোকেরই অসুখবিসুখে ঋণ করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়; সকলের ঋণগ্রহণের সেরূপ সুবিধা নাই; কাজেই শেষ পর্য্যন্ত শতকরা ১৫ জনই প্রতিবৎসর মৃত্যুর সুশীতল ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া দেনা পাওনার অতীত লোকে প্রস্থান করে।

কাটা শঙ্খ ঘষিয়া সমান করিবার কাজে বালকও নিযুক্ত হইয়া থাকে; ইহাদের পারিশ্রমিক মাসিক ৫৲—৫॥০ টাকা হারে দেওয়া হয়। দুঃস্থ পরিবারের মেয়েরা শঙ্খের আংটি প্রস্তুত করিতেও সাহায্য করে। আংটির প্রতি শতে ৩—৪৲ টাকা হিসাবে পারিশ্রমিক পাওয়া যায়। ইহা কিন্তু কোনও পরিবারের প্রধান আয় বলিয়া গণ্য হয় না।

শ্রমজীবীদের সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে আরও একটি কথা উল্লেখযোগ্য। শাঁখারিদের মধ্যে ধনী লোকের সংখ্যা বেশী নহে; এবং যে কয় জন অর্থশালী শাঁখারি আছেন, তাঁহারা নিজে কাজ না করিয়া মজুর রাখিয়া কাজ করান। বর্ত্তমানে এরূপ লোকের সংখ্যা পূর্ব্বের অপেক্ষা বেশী বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। 'জে-বি-দত্ত অ্যাণ্ড সন্‌স্' কোম্পানীর হাতে যখন শঙ্খ আমদানী করিবার একায়ত্ত অধিকার ছিল, তখন তাঁহারা শঙ্খকারদিগকে ধারে শঙ্খ লইয়া তাহাতে শাঁখা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিয়া যথাকালে সুদ-সহ আসল টাকা পরিশোধ করিতে দিতেন। কাঁচা মালের দাম কিরূপ লইতেন, তাহা অনুমান না করিলেও ইহা বেশ বোঝা যায় যে, তাঁহারা এরূপ অসঙ্গত মূল্য বা অধিক সুদ লইতেন না, যাহাতে শাঁখার মজুরি অথবা দোকানদারির লাভ কমিয়া যাইত; কারণ, তাহা হইলে শাঁখারিরা তাঁহাদের নিকট হইতে শঙ্খ না লইয়া মহাজনের কাছেই দাদন লইয়া কাজ করিত। শঙ্খের মূল্যবৃদ্ধি হওয়ায় এবং কাটার কার্য্যে লোকের অভাব
... শিল্পের অবস্থা ক্ষীণ করিয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু কেবল মাত্র এই দোষগুলিই সংশোধন

করিলে এই শিল্প সজীব ও সতেজ হইয়া উঠিবে না। শ্রমিকদের অবস্থা উন্নত হওয়া চাই। ঢাকার শঙ্খকারদের সমবায় সমিতি আজ প্রায় চারি বৎসর হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; বর্ত্তমানে শঙ্খ তাহাদের হাত দিয়াই আমদানি হইতেছে; কিন্তু শ্রমজীবিগণ যথা পরিমাণে ইহার সভ্য না হওয়ায় তাহারা শঙ্খ কিনিবার সুযোগ পাইতেছে না; বিশেষতঃ শঙ্খের আমদানি নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়ায় তাহাদের খুচরা দরে শঙ্খ কিনিবার শক্তি কমিয়া আসিয়াছে। অগত্যা তাহারা ধনী শাঁখারিদের নিকট দাদন লইয়া মজুর হইয়া কষ্টে দিনপাত করিতেছে। সমবায় সমিতির ঋণ দানের প্রথা উল্লেখযোগ্য নহে, অথচ ইহাদের মধ্যে কোন রকমের শিল্পসহায় ব্যাঙ্ক (Industrial Bank) না থাকাতে বাধ্য হইয়া মহাজনের নিকট দাদন লইয়া কাজ করিতে হয়। ঋণ গ্রহণের সুবিধার অভাবে শঙ্খশিল্পে ধনিক-প্রাধান্যের (Capitalism) বিষবৃক্ষের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছে এবং বর্ত্তমান সমবায় সমিতি শ্রমিকদিগকে যথাপরিমাণে সভ্য করিতে না পারিয়া, পরোক্ষ ভাবে এই বিষয়ে পোষকতা করিতেছেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে হইলে সমবায় সমিতির কর্ম্ম আরও ব্যাপক করা আবশ্যক;—কেবল মাত্র শঙ্খ আমদানি করিয়া সভ্য শাঁখারিদের মধ্যে অংশের মূল্যের অনুপাতে বিক্রয় করিলেই হইল না; শ্রমিকদিগকে উপযুক্ত সংখ্যায় সভ্য করিয়া ইহার উপকার লাভ করিতে না দিলে, সমবায় সমিতির সাহায্যে তাহাদিগকে সুলভ যন্ত্রাদি ক্রয় করিতে না দিলে, তাহাদের প্রস্তুত শাঁখা বিক্রয় করিবার জন্য 'ষ্টোর্স' (Stores) খুলিয়া না দিলে, এই সমবায় সমিতির নামের সার্থকতা রহিবে না। ঋণদানের (co-operative credit) ব্যবস্থা করাই বর্ত্তমানে অত্যাবশ্যক। সমবায় সমিতি পূর্ব্বোক্ত কার্য্যগুলির ভার গ্রহণ করিলে, ঋণ গ্রহণের সৌকর্য্যার্থে শিল্প সহায় ব্যাঙ্ক স্থাপন করাই শ্রেয়ঃকল্প।

শঙ্খবিক্রয়ে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের বণিগ্‌বৃত্তির কথার উল্লেখ করা হইয়াছে। এই বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্ণয়ে মতভেদ নাই; সকলেই একবাক্যে বলিবেন যে, এরূপ সঙ্কীর্ণ স্বার্থান্বেষণ ত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে ঢাকার সমবায় সমিতির নিকট শঙ্খ বিক্রয় করা উচিত। একটি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের পক্ষে স্থূলদর্শী বণিক্‌নীতি শোভা পায় না; বিশেষতঃ লোকহিতার্থে একটু অল্প মূল্যে শঙ্খ বিক্রয় করিলে যখন রাজস্বের প্রচুর ক্ষতি হয় না, তখন প্রজার সুবিধা দেখিয়া চলাই সমীচীন।

আপাততঃ শঙ্খ কাটিবার একটি কল আবিষ্কৃত হইলেই যথেষ্ট শ্রম লাঘব ও ক্লেশ নিবারণ হইবে। কলিকাতা রিভিউ পত্রিকায় এ সম্বন্ধে শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন যে, 'ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল্ ইঞ্জিনিয়ার' বাড্‌সাহেব কল আবিষ্কার করিতে গিয়া নানাপ্রকার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। ধাতু নির্ম্মিত চক্র দ্রুত অথবা ধীর গতিতে ঘুরাইয়া শঙ্খকাটায় সুবিধাজনক ফল পাওয়া যায় নাই। একপ্রকার elastic-composition grinding disc ব্যবহার করিয়া

সন্তোষজনক কাজ পাওয়া গিয়াছে। এই যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া পাঠাইবার জন্য বাড্ সাহেব বিলাত লিখিয়াছেন। যন্ত্র নির্ম্মিত হইলে তাহা তাড়িত শক্তিতে চালিত হইয়া মিনিটে ৪০০০ বার ঘূর্ণিত হইয়া অতি সহজেই শঙ্খ কাটিয়া শাঁখা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা সহজ করিয়া তুলিবে। এই যন্ত্রের মূল্য কত হইবে, জানা যায় নাই; অধিক হইলে সাধারণ শ্রেণীর শাঁখারিরা নিজে কিনিয়া ব্যবহার করিতে পারিবে না; তাহা হইলে শাঁখারি বাজারের দুই চারিজন ধনী ব্যক্তিই যন্ত্র কিনিয়া কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবেন, অন্য লোকে তাহাতে মজুর হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। যন্ত্রের মূল্য বেশী না হইলে, শিল্পসহায় ব্যাঙ্ক অথবা সমবায় ব্যাঙ্ক হইতে ধারে মূলধনের টাকা লইয়া উদ্যোগী বিচক্ষণ মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকেরা যন্ত্র কিনিয়া ক্ষুদ্রতর প্রতিষ্ঠানে শাঁখার ব্যবসায় চালাইবার সুযোগ পাইবেন এবং শিল্পে ধনিকপ্রাধান্য সেরূপ প্রবল হইয়া উঠিবে না। শঙ্খশিল্পের আয়তন এত বৃহৎ নহে যে, ইহাতে অতি ব্যয়সাধ্য জটিল যন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভজনক হইবে। মধ্যবিত্তলোকের হাতে ব্যবসায়ের কর্ত্তৃত্ব থাকিলে একদিকে যেমন কলের প্রচলনের সুবিধাগুলি পাওয়া যাইবে, অপরদিকে সেরূপ গুরুতর শ্রমিক সমস্যার উদ্ভব হইবে না। কলের ব্যবহারে আরও কতকগুলি আনুসঙ্গিক সুবিধা পাওয়া যাইতে পারে—যেমন ভাঙ্গা শঙ্খ হইতে বোতাম প্রস্তুত করা, শঙ্খের কুঁচি পোড়াইয়া চূণ প্রস্তুত করা, এবং চর্ম্মরোগের ও বসন্তক্ষতের চিহ্ন লোপ করিবার জন্য প্রসাধন রূপে ব্যবহার্য্য শঙ্খচূর্ণ প্রস্তুত করা। শেষোক্ত লেখকের মতে শঙ্খচূর্ণের ব্যবসায়টি গড়িয়া তুলিতে পারিলে খুব লাভ জনক হইবে।

শাঁখার আদর আমাদের দেশে চিরদিন থাকিবে। দরিদ্র স্ত্রীলোকদের কাছে, পল্লী-রমণীর নিকট, ছোটনাগপুরের সাঁওতাল ও চট্টগ্রামের মগ মেয়েদের কাছে মোটা শাঁখার আদর ও ব্যবহার পূর্ব্বের ন্যায় এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, ফ্যাসানের পরিবর্ত্তনে কেবল শহরবাসী মেয়েদের রুচিভেদ হইয়াছে। রিজেন্ট 'ৎসোমোলিং' এর আমল হইতেই তিব্বতে মোটা শাঁখার ব্যবহার আছে। সেখানেও ভারী শাঁখার কাটতি খুব বেশী; ভবিষ্যতে ও এরূপ থাকিবে। বাংলার যেখানে মোটা শাঁখা প্রস্তুত হয়, সে সকল স্থানের শিল্প ও ব্যবসায় অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে; সরু শাঁখার কাটতি শহরে মেয়েদের মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, এবং ইহাদেরই পছন্দের রং ফিরিয়াছে বলিয়া ঢাকার শাঁখার আদর কমিয়া গিয়াছে। কতকটা এই জন্য এবং কতকটা পূর্ব্বোক্ত কারণে এখানের শঙ্খশিল্পের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে ইহাকে এই অবস্থা-সঙ্কট হইতে রক্ষা করিতে পারিলে ভবিষ্যৎ নেহাৎ অন্ধকার নহে। বর্ত্তমান-অসহযোগ আন্দোলন বিদেশী পণ্যের প্রতি ঘৃণা জাগাইয়া তুলিয়া শিক্ষিত ও দেশভক্ত মহিলাদের রুচির অনেক পরিবর্ত্তন করিয়াছে; ইহাদের নেতৃত্বে মহিলা সমাজে এই পরিবর্ত্তন আরও ব্যাপক ও স্থায়ী হইবে বলিয়া আশা করা অসঙ্গত নহে; শাঁখার

উপর সোনার কারুকার্য্য করিয়া কলানৈপুণ্যের নব নব প্রকাশে শাঁখার চারুতা ও মনোহারিতা বাড়াইয়া, বহুকাল পর্য্যন্ত ধনি-গৃহিনীদের রুচি ও অনুরাগ আকর্ষণ করা, পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অনেক সহজ হইয়াছে।

ভারতীয় শিল্পের কথা প্রসঙ্গে বিলাতের শ্রেষ্ঠ অর্থবিজ্ঞানবিদ্ মার্শ্যাল্ সাহেব বলিয়াছিলেন :—জগৎ যেমন অনির্ব্বচনীয় ভাবসম্পদের জন্য ভারতবর্ষের নিকট ঋণী, তেমনই অনেক সূক্ষ্ম চারু শিল্পের জন্যও ইহারই মুখাপেক্ষী ছিল। স্মরণাতীত যুগ হইতে ভারতীয় শিল্পের যে কলামাধুর্য্য, যে সামঞ্জস্য এবং সৌন্দর্য্যের উপাসনা আমাদের শিল্প-প্রতিভার নানারূপ আত্মপ্রকাশে আপনার রঙ্ ফলাইয়া তুলিয়াছে, পাশ্চাত্যের শ্রীহীন বিত্তের কদর্য্যতার হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে না পারিলে, চরম লক্ষ্যের ঠাহর হারাইয়া ভবিষ্যতের শিল্পে আমরা সার্থকতা খুঁজিয়া পাইব না। আমাদের আর্থিক সমস্যা বিদেশী ছাঁচের নহে ; আমাদের আর্থিক নিয়তি পাশ্চাত্যের ঠিক অনুরূপ হইবে না। ইতিহাসের পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসারে আমাদের শিল্পপ্রতিভার বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া আমাদের ঐহিক ঐশ্বর্য্যের যে বিকাশ হইবে তাহাতে কারখানার সহিত গৃহশিল্পের স্থান থাকিবে, উভয়ের সামঞ্জস্য থাকিবে। এখানেই আমাদের গৃহশিল্পের সার্থকতা। শিল্পে আমাদের প্রাচীন আদর্শের সহিত পাশ্চাত্যের নবযুগের আদর্শের সংযোগ ও সুসঙ্গতি হইলেই আমাদের শক্তি শ্রীমণ্ডিত হইবে ; তখন আমাদের ধূম্রাচ্ছন্ন ধূলিমলিন কারখানা ঘরে মহাসমুদ্রের নির্ম্মল বায়ু-প্রবাহ প্রবেশ করিয়া সকল গ্লানি ধৌত করিয়া দিবে ; আকাশের উদার আলোক অবাধে ভিতরে ঢুকিয়া সঙ্কীর্ণতার অন্ধকার দূর করিবে। এই জন্যই ভবিষ্যতের ইতিহাসে আমাদের সজীব সতেজ গৃহশিল্পগুলির প্রয়োজন, এবং এই কারণেই শঙ্খশিল্পের ন্যায় প্রাচীন ও নিত্যাবশ্যক গৃহশিল্পের সংরক্ষণে ও সংস্কার সাধনে আমাদের যত্নশীল হওয়া আবশ্যক।

প্রতিশোধ

(শ্রীশিব দাস)

মায়ের কোলে শিশু যখন মায়েরি বুকে আঘাত করে,
চুম্বনে তারি মুখখানা ভরি প্রতিশোধ মা লয় আদরে।

গৃহস্মৃতি

(শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়)

কত সুন্দরী-কণ্ঠ-কাকলী
ধ্বনিত করেছে এ গৃহতল,
নূপুরের শত অস্ফুট গাথা,
দিকে দিকে জাগে অচঞ্চল !

কত বাসরের মন্থন সুধা—
দেয়ালে জাগা'য়ে অফুরাণ ক্ষুধা ;
বাতাসের সনে মিশিয়া রচিছে
উদাসী স্বপন ভূমণ্ডল !

আশার আবেশে চোখ দু'টী ভরি'
বাতায়ন পাশে অবশ প্রিয়া ;
নীলাকাশে রচি বিরহ-স্বপন
উতাল করিছে নিখিল হিয়া !

চোখ দু'টী আজো ভেসে আছে তার,
যৌবন-সাধ, বাসনা অপার !
দীর্ঘ নিশাসে বুক চাপা ভাষা
ভাসে অনন্ত বারতা নিয়া !

নিশীথের কথা, আঁধারের ব্যথা,
মন-অভিলাষ, স্বপন ছায়
কত হা হুতাশ, তপ্ত নিশাস
চঞ্চল করে উতলা বায় !

প্রসাধন কালে, ছলের মাধুরী,
চোখে চোখে নিতি কত লুকোচুরি,
দেয়ালের প্রতি পরতে পরতে
রেখেছে গাঁথিয়া কলিজা হায় !

মাতার স্নেহের মধু-অঞ্চলে,
ভ্রাতৃ প্রেমের তিক্তকারি'
ভগ্নীর স্নেহ, বন্ধু প্রীতিতে
সুখ-হিমাদ্রি উঠিত গড়ি' !

ফাল্গুনী বায় মধু হিন্দোলে
পিয়াসায় রাঙ্গা বক্ষ-নিচোলে !
জাগিয়া উঠিত কত বসন্ত,
নিতি নব নব ছন্দ ধরি' !

আজি বিধবার রিক্ত পরাণ
মরুভূ'র সম রয়েছে জাগি !
পারাবত করে স্মৃতি বন্দনা,
গাহে গান চির পিয়াসী লাগি' !

আজি যেন ফুল উত্তর বায়
কোরকের মাঝে অকালে শু'কায় !
শত অপূর্ণ বাসনা-সমাধি
নিশিদিন নব জীবন মাগি' !

চিত্র ও চিত্রকর

(শ্রীনীরদবন্ধু চৌধুরী)

আমি চিত্রকরও নই ভাস্কর শিল্পীও নই, একথা ঠিক, কিন্তু তবু যে কেন চিত্রের বিষয়েই আমার কিছু বলবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে সে কথাটারই আজ কতক আলোচনা করব।

চিত্র ও ভাস্কর্য্যের আদর ভারতে বহুদিন থেকেই হয়ে আসছে। এজন্যই এই চারু শিল্পকলাগুলির যথেষ্ট উন্নতিও হয়েছিল। রাজার আনুকূল্যে, ধনীর আগ্রহে ও ভক্তের ব্যাকুলতায় তাদের বিকাশ। যেখানে সময়ের প্রয়োজন, অর্থের প্রয়োজন ও বিশেষজ্ঞ শিল্পীর প্রয়োজন, সেখানে সাহায্য করতেন শিল্পপ্রিয় রাজা ও সম্রাট্‌গণ। আমোদের জন্য, বিলাসের জন্য যেখানে শিল্পের প্রয়োজন, সেখানে অর্থব্যয় করতেন ধনী জমিদার ও বণিক্‌গণ এবং যেখানে ভক্তের ব্যাকুলতা তার সমস্ত প্রাণ মন ঢেলে দিত দেবতার চরণ তলে, সেখানে অর্থব্যয় করে দেবদেবীর মূর্ত্তি তৈরী করাতেন তাদেরই মত ভক্ত মহানুভব অর্থশালী ব্যক্তিগণ।

শিল্পের জন্য, চিত্রের জন্য এ ব্যাকুলতা লোকের মনে এখন কতদূর আছে বা নেই, তা নিয়ে আলোচনা করবার প্রয়োজন দেখি না—তবে সব গিয়ে এখন অবশিষ্ট আছে যেন চারুশিল্পকলা হিসাবে তার একটা বাহ্যিক আদর।

এই আদরটা for art's sake বল্‌লেও বোধ হয় একেবারে ভুল হবে না। মনের একাগ্রতা ও ব্যাকুলতা হারিয়ে এই বাহ্যিক আদরে তাকে গ্রহণ করবার যা ফল, তা ফলেছে। সাহিত্য এবং আর্ট এই দু'য়ের মধ্যেই যেন একটা আদর্শ ও অনুশীলনের স্থবিরতা (stagnation) এসে পড়েছে; জমাট জলের পচা দুর্গন্ধ যেমন চারিদিক বিষাক্ত ও অস্বাস্থ্যকর করে তোলে, সেই রকম শিল্পকলার এই স্থবিরতাটা সাহিত্য ও শিল্প উভয়কেই পঙ্গু করে দিয়েছে। অনুকরণের ব্যর্থতায় ও গবেষণামূলক প্রবন্ধের অভাবে একদিকে যেমন সাহিত্য পিছিয়ে পড়ছে, অন্যদিকে চিত্রকরগণের ভাবের ব্যাভিচারিতায় চিত্রাদি শিল্পকলাতেও আবিলতা দেখা দিয়েছে। তার কতকগুলি কারণ বল্‌লেই অনেকে ব্যাপারটা কতক বুঝ্‌তে পারবেন।

প্রথম কথা চিত্র নয়েই আরম্ভ করা যাক। চিত্র জিনিষটা কি? কোন বিশেষ একটা ভাব প্রকাশ করবার জন্য রং ও তুলির সাহায্যে যে গঠন বা আকৃতি দেওয়া হয়, তাকে চিত্র বলতে পারি। মোটামুটি ভাবে সংজ্ঞা কতকটা এ রকমই হবে বোধ হয়। কবি যেমন অক্ষরের পর অক্ষর গেঁথে আমাদের চোখের সামনে একটা চিত্র আঁকতে চায়, তেমনি চিত্রকরও বিশেষ কয়েকটী রেখার সাহায্যে বিশেষ একটা ভাব ও কল্পনার আকার দিতে চায়। কবি যেমন এক হিসাবে চিত্রকর, তেমনি চিত্রকরও এক হিসাবে কবি। সেজন্যই বোধ হয়

কবির নিকট চিত্রকরের এত আদর ও চিত্রকরের নিকট কবির এত সম্মান। তারা চায় সকলকে দেখিয়ে দিতে কি সৌন্দর্য্য আমাদের চারিদিকে ছড়িয়ে আছে; তাই কবি নিজের সুরে, কথার ছন্দে বাজিয়ে তোলে সৌন্দর্য্যের লীলানিকেতন এবং চিত্রকর হৃদয়ের সৌন্দর্য্যে তুলির স্পর্শে রাঙিয়ে তোলে তার চারিদিকের মূক দৃশ্যরাজি। দু' জনেই সৌন্দর্য্যের পূজারী।

সাধারণতঃ দেখতে পাই সৌন্দর্য্য দু' ভাগে বিভক্ত :—যেটা প্রকৃতির মধ্যে ছড়িয়ে আছে এবং যেটা সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। অনেক সময় আবার এই দুয়ের সমন্বয়ও দেখতে পাই। যেমন প্রকৃতির কবিদের আখ্যা দেওয়া হয়েছে Poets of Nature, তেমনি একদল চিত্রকরও আছে যারা কেবল প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকেই পূজা করেন, তাদের বলা যেতে পারে Artists of Nature. আবার একদল কবি আছেন যারা সামাজিক সৌন্দর্য্যটাই বেশী লক্ষ্য করেন, তেমন একদল চিত্রকরও আছেন যাঁরা সামাজিক সৌন্দর্য্যেরই প্রতিরূপ আঁকেন। সামাজিক সৌন্দর্য্য সাধারণতঃ মানব সমাজকে বেষ্টন করে গড়ে উঠেছে; মানুষই তার কর্ত্তা ও বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু।

চিত্রকর যদিও শৈশব, যৌবন, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি মানুষের প্রত্যেক বয়সেরই বিশেষত্ব দেখিয়ে চিত্র আঁকেন, তবু সৌন্দর্য্যের উপাসক যাঁরা, তাঁদের বেশীর ভাগ চিত্রই থাকে সৌন্দর্য্যের পূর্ণবিকাশ যৌবনকে ঘিরে। কবি ও চিত্রকর দুইই কেন নারী-চিত্র আঁকে? তার উত্তরে বলা যেতে পারে যে নারী তার কোমল হৃদয়-বৃত্তি, আশ্রয় প্রার্থী কোমল দেহ এবং পরমুখাপেক্ষী ব্যাকুল মিনতি দিয়ে কবি ও চিত্রকর উভয়েরই হৃদয় অধিকার করে নিয়েছে। এজন্যই তারা নারীকে এত মহীয়সী ও গরীয়সী করে দেখবার চেষ্টা করেন। সেজন্যই কবি ও চিত্রকরের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন নারী চরিত্রকে ঘিরেই বর্দ্ধিত, মুকুলিত ও বিকশিত হয়ে উঠেছে।

প্রকৃত চিত্রকর সে—যে সেই নারীর হৃদয়ের কথা—আনন্দের হউক, নিরানন্দের হউক যে কোন অবস্থার বা ভাবেরই হউক না কেন,—তার তুলির স্পর্শে প্রকাশ করতে পারে। সেখানেই তার প্রকৃত সৌন্দর্য্যের পূজা সম্পন্ন হয়, আদর্শের সম্মান রাখা হয়। কিন্তু তা না ক'রে যে তার বাইরের সৌন্দর্য্য দেখিয়েই ক্ষান্ত থাকে, তার হৃদয়ের পরিচয় দিতে চায় না, সে সুদক্ষ চিত্রকর নয়। মেয়েদের হৃদয়বৃত্তি কোমল, দেহযষ্টি ও অঙ্গুলী সমূহও কোমল; সেজন্য যদি তার অঙ্গুলী প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতিই আমরা বিশেষ লক্ষ্য রেখে চিত্র আঁকি, তবে আমাদের চিত্রকলার সম্মান রাখা হয় না, তা বলাই বাহুল্য। হৃদয়ের বিশেষ কোন অবস্থা ফুটিয়ে তুলতে হলেই নগ্ন সৌন্দর্য্যের আশ্রয় নিতে হবে, তার কোন অর্থ নেই। বিশেষ কোন ভাবের অভিব্যক্তিতে নগ্নতার কি প্রয়োজন?

চিত্রকরের চক্ষে হয়ত নগ্নতা বলে কোন জিনিষ না থাকতে পারে কিন্তু সমাজের চক্ষে ত আছে এবং সমাজ এখনও অনেক দিন পর্য্যন্ত তা মেনে চলবে বলেই মনে হয়। তবে নগ্ন-সৌন্দর্য্য যে মন্দ তাও বলছি না। কারণ একজন দক্ষ চিত্রকর যদি যৌবনের চিত্র আঁকতে চায়

তখন তার আদর্শ কেমন, সে দিকে তার দৃষ্টি রাখবার প্রয়োজন হয় না—সে যা আঁকতে চায়, সে চিত্রের নাক, মুখ, চোখ ও অন্যান্য অবয়বে যৌবনের মদিরতা ও সৌন্দর্য্যের পূর্ণবিকাশ হয়েছে কিনা কেবল তাহাই দেখবে। তখন সে যদি সমালোচনা ও লোক চক্ষুর ভয়ে তার আদর্শকে বৃথা ঢাকবার চেষ্টা করে, তবে বুঝতে হবে চিত্রকর তার আদর্শের অসম্মান করছে। নির্ভীক হৃদয়ে আদর্শকে তুলির স্পর্শে রঞ্জিত করাই চিত্রকরের সার্থকতা ও পূর্ণতা। কিন্তু তার চিত্রিত মূর্ত্তি পূজার বেশে, পূজার দ্রব্য নিয়ে যেখানে পূজার জন্য চলেছে, সেখানে পূজারিণীর মনের একাগ্রতা ও ভক্তির তন্ময়তার পরিবর্ত্তে যদি চিত্রকর শুধু যৌবনের নগ্ন সৌন্দর্য্য প্রকাশ করবার চেষ্টা করে তবে তার তুলি স্পর্শ করাই বৃথা। চিত্রের সম্মান, চিত্রকলার সম্মান সে ত জানেই না, অধিকন্তু, চারু শিল্পকলার মধ্যে আদর্শের ব্যাভিচারিতার বিষবীজ বপন দোষে সমাজের নিকট সে অপরাধী ও দণ্ডার্হ। সে জন্যেই তুলির সংযম চাই। কেহ কেহ বলতে পারেন যে, এ প্রকার সংযম রাখতে গেলে চিত্রকরের স্বতঃস্ফূর্ত্তিভাব নষ্ট হয়ে যায়, আমরা চিত্রের বা চিত্রকরের যথার্থ পরিচয় পাই না। তবু সমাজের মঙ্গল কামনা করলে সাহিত্যের গতির সঙ্গে সমান ভাবে পা ফেলে চলাই উচিত। শিল্প বা সাহিত্য কারো উচিত নয়, অপরকে পিছনে ফেলে আসা। চিত্রকলা যদি সাহিত্যকে পশ্চাতে ফেলে বহুদূর অগ্রসর হয় তবে সাহিত্যিকগণ চিত্রের নিন্দা করবে তাতে আশ্চর্য্য কি! বস্তুতঃ কেউ কাকে বেশী দূরে রেখে যেতে পারে না, কারণ একের দ্বারা অপরের গঠন ও অপরের গঠনেই একতার শ্রীবৃদ্ধি; কিন্তু এমনও চিত্রকর আছেন যিনি হয়ত বলবেন যে সাহিত্যকে ফেলে যাওয়াটা চিত্র বিদ্যার দোষ নয়, চিত্রকরের মানসিক চিন্তার ও উন্নতির উপরই তার চিত্রের শুভাশুভ নির্ভর করে। কিন্তু যে কারণেই হোক্ সমাজকে পশ্চাতে ফেলে হাওয়ায় ভেসে যাওয়া ঠিক নয়।

আজকালকার পত্রিকা বা চিত্রপ্রদর্শনীতে যে সমস্ত ছবি প্রকাশিত বা প্রদর্শিত হয়ে থাকে, তার মধ্যে বেশীর ভাগই শারীরিক নগ্ন সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তি বা প্রতিমূর্ত্তি। ভাবের অভিব্যক্তির পরিবর্ত্তে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশেষের বিকাশ সাধন করা চিত্রকরের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। কিন্তু এই ঔচিত্য বোধ দেখতেছি অনেক চিত্রকরেরই নেই।

আমার মনে হয় আজকালকার চিত্রকরগণ এই নগ্ন সৌন্দর্য্যের আদর্শ পেয়েছেন ভাস্কর্য্য শিল্প হতে। চিত্র ও ভাস্কর্য্যের চিরদিনই অতি নিকট সম্বন্ধ। ভারতীয়, গ্রীক বা ইতালীয় সমস্ত ভাস্করগণই নগ্নমূর্ত্তিই বেশী তৈরী করেছেন, কিন্তু তাঁদের মহত্ব নগ্নতায় নয়, তাঁদের মহত্ব ভাবের বিকাশে; এই ভাব প্রকাশ করতে পেরেছেন বলেই তাঁরা আজ জগতে এত সম্মান পেয়েছেন। আমাদের দেশের চিত্রকলার এমন দুর্দ্দশা হয়েছে যে আদর্শের অভাবে (?) নবীন চিত্রকরগণ কেউ কেউ নিজের স্ত্রীর ফটো একটু কেটে ছেটে বিভিন্ন ভঙ্গীতে বিভিন্ন রঙ্গে এঁকে পত্রিকায় প্রকাশ করতে বা প্রদর্শনীতে পাঠাতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। সুবিজ্ঞ চিত্রকরগণ এই প্রবন্ধ পাঠ করলেই বুঝতে পারবেন যে ইহা সমস্ত চিত্রকরদের লক্ষ্য করে লেখা হয় নি, বিশেষ কোন দলকে সমাজের নিকট প্রকাশ করাই আমার ইচ্ছা।

দীক্ষা

(শ্রীঅনঙ্গমোহন ভৌমিক)

ভক্ত সেদিন্ তুচ্ছ করিয়া রোগিনীরে তার উৎসব দিনে
চলে গেল যেথা গোঁসাই ঠাকুর দীক্ষা প্রদানে ভক্তাধীনে।
সকলের শেষ ভক্তবরের আহ্বান এল দীক্ষা তরে,
সুধাল ঠাকুর—'কহ কি মূরতি বিরাজে তোমার অন্তরে'।
চক্ষু মুদিয়া ভক্ত প্রবীণ খুঁজিতে লাগিল চিত্ত মাঝে,
কোথা ভগবান্, একি অকল্যাণ রোগিনীর ছবি সেথা যে রাজে !
যত জোর করি সে ছবি ভক্ত অন্তর হ'তে ঠেলিতে চায়,
দেবতারে তার আবরিয়া তত অন্তর পটে উজল ভায়।
গোঁসাই চরণে লুটাইয়া পড়ি ভক্ত কহিল আর্ত্ত স্বরে,
'ঘরেতে পড়িয়া, রুগ্না প্রেয়সী, তাহারি মূরতি চিত্ত ভরে'।
হাসিয়া ঠাকুর কহিলা তখন—'ফিরে যাও তবে আপন গেহে,
সেবা কর গিয়ে জায়া রোগিনীরে, ভগবান তব তাহারি দেহে'।

আসল ও নকল

(শ্রীতাপসকুমার দত্ত)

কথায় বলে, "এক পা এগিয়ে তিন পা পিছিয়ে যায়"। চুপ্‌টি করে আমরা একটু যদি ভেবে দেখি জগৎটা এগুচ্ছে কি পিছুচ্ছে, তা হলে কি দেখতে পাই ? বিজ্ঞান এসে মুখটী উঁচু করে বলবে, "আমি দুনিয়ার রহস্য গুলো গুটীপোকার সেই সূক্ষ্ম সূতোর মত দিন দিন তিল তিল করে টেনে বার করছি ; মানুষ চোখ বুজে আমারি হাত ধরে সেই অনন্ত প্রকৃতির ওপর একটা আধিপত্য জুড়ে বসে আছে ; ডাঙ্গায় বসে পৃথিবীর সব সুখগুলো দুহাতে কুড়িয়ে নিচ্ছে ; আবার পাখীটির মত দুটী পাখা মেলে হাওয়ায় হেলে দুলে অনন্ত আকাশে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে ; কিন্তু সেখানেই কি নিশ্চিন্তি ? চেয়ে দেখ, যেখানে মানুষের একটী মুহূর্ত্ত তিষ্ঠোবার যোটি নেই, সেই মাছ কুমীরের দেশে তাদেরি জাত ভাই হয়ে একটা নূতন রাজ্যের জাল বুনছে !" সেই 'পরীর

দেশের' সভ্যতা এসে বলবে, "মানুষ, আমি তোমায় কি এক নূতন জীব গড়ে তুলেছি ; কুসংস্কারের আঁধার হতে, কুকুর শেয়ালের অন্ধ জীবনকে এক নূতন আলোর সম্মুখে দাঁড় করে দিয়েছি ; চিড়িয়াখানার সেই শেকল বাঁধা পাখীটিকে স্বাধীনতার ফুরফুরে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়েছি ; গাধা পিটে ঘোড়া করেছি ; ঘোড়া পিটে মানুষ করেছি ; এমনি করে খোদার ওপর খোদ্‌কারী করে তোমার ছোট্ট জীবনটাকে মহৎ করে তুলে ধরেছি।" আবার ধর্ম্ম এসে মুখ ফুটে বলবে, "এই যে মাটীর শরীর দেখছ, দুটো হাত, দুটো পা ইত্যাদির একটা সমষ্টি, চেয়ে দেখ এরি ভেতর একটা অনন্ত আত্মা কি এক বিচিত্র খেলা খেলছে, যেটা নিয়ে আজ তুমি সবার হতে বড় বলে বড়াই করছ। তোমার ভাইকে তুমি চিনতে না, তোমার দেশকে তুমি ভুলে ছিলে, তোমায় যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁকে তুমি বলতে, তোমারি মত একটা গাছ পাথরের ছায়া কিন্তু কে তোমায় বলে দিল তোমার জীবন আছে, আত্মা আছে, সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন এবং সবার ওপর একটা অনন্তের প্রকাশ বিরাজ করছে যাকে তুমি একদিন স্বপ্ন বলে, ছায়া বলে, ধূঁয়ো বলে জানতে ?" এমনি করে চারদিক থেকে যখন একটা বিশ্ব বীণার সুর বেজে উঠে তখন আমরা কি ঠিক করে বলতে পারি, আমাদের জীবনটা এগুচ্ছে কি পিছুচ্ছে ? এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে সবাইকে স্বীকার করতে হবে, আমরা এগুচ্ছি কিন্তু সেই এগুনোর ভেতর যে মস্ত একটা রহস্য রয়ে গেছে, সেটা হঠাৎ দেখতে গেলে আমাদের চোখের সম্মুখে ফুটে উঠতে চাইবে না। পৃথিবীর বুকের ওপর দাঁড়িয়ে কি কেউ বলতে পারে, পৃথিবী ছুটে বেড়াচ্ছে, কি বসে আছে ? মানুষের জীবনটাকে একটা আর্শীর ওপর ফেলে তার ছায়াটুকুন কেবল দেখতে পাব, তার আসল অস্তিত্বটুকু হারিয়ে ফেলব। আঁধার আলোর কাছে ধরা দেয়, ছায়া মূর্ত্তির কাছে প্রকাশ পায়, নকল আসলের আড়ালে লুকিয়ে থাকে, আসল নকলকে আড়াল করে, ছাপিয়ে উঠে। কিন্তু সময়ের স্রোতে মানুষের জীবন যেমনি ধুয়ে চলে যায়, তেমনি সময়ের স্রোতে আবার মানুষের গায়ে ধূলো কাদার একটা ছাউনি পরে, যে ছাউনি মানুষকে মানুষবলে চিন্‌তে দেয় না, মানুষকে এক পা এগিয়ে তিন পা পিছিয়ে দেয়। একজন জার্ম্মাণ দার্শনিক বলেছেন,—"Man advances when he keeps himself one with nature and clings fast to truth." কিন্তু এই প্রকৃতিই বা কি, এই সত্যই বা কোথায় ? তাই বলছিলুম, আমাদের জীবনটা একটা সত্যি ও মিথ্যের অভিনয়, একটা আলো ও ছায়ার খেলা, একটা আসল ও নকলের ঝিকিমিকি ! কিন্তু, রহস্যকে রহস্য বলে ধরে বসে থাকলে, রহস্য চিরদিন রহস্য হয়ে পড়ে থাকবে। রহস্যকে সোজা করে, সরল করে দেখতে হবে, ভাবতে হবে, গ্রহণ করতে হবে ; তা হলেই রহস্যের সত্যটুকুন বেরিয়ে পড়বে।

এই যে আজকাল একটা হাওয়া উঠেছে, একটা বাড়াবাড়ি দেখা দিয়েছে, সেটা কি প্রকৃতির সাথে আমাদের জীবনের একটা প্রকাণ্ড লড়াই নয় ? মানুষ দু হাজার বছর আগে যেমন

ছিল, তেমনটী কি আর এখন আছে? বিশেষত্ব টুকুন কোথায়? এই যে বিজ্ঞানের উন্নতি, দর্শনের উন্নতি, ভাষার উন্নতি, শিক্ষার উন্নতি, সভ্যতার উন্নতি, এটার আরম্ভ কোথায়; শেষই বা কোথায়? ইতিহাসের পাতা উল্টে আমরা বলব, আমরা কি ছিলুম, কি হয়েছি; কোথায় ছিলুম, কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি। যাঁরা সমাজকে গঠন করেছেন, Parliament তৈরী করেছেন, ধর্ম্মকে স্পষ্ট করে, সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন, তাঁরা বড়াই করে বলবেন, মানুষ একদিন কুকুর শেয়াল ছিল, আজ মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছে; একদিন এক পা জমির ওপর বাড়ী তৈরী করে ভাবত, দুনিয়াটা বুঝি এই চারটী দেয়াল; আর আজ এক পা দু' পা করে গোটা পৃথিবীটা বেড়িয়ে এসে বুঝতে পারছে "সীমার বাইরে অসীম আছে, অন্তের বাইরে অনন্ত আছে।" কিন্তু সত্যি কি আমরা অতীতকে পিছু ফেলে উন্নত হয়েছি, বড় হয়েছি, মহৎ হয়েছি? তা যদি হত, তা হলে যুগে যুগে বিশ্ব-আত্মার প্রতিমূর্ত্তি হয়ে এক একটি জীবাত্মা মাটীর দেহ গ্রহণ করে ঐ একই তানে, একই সুরে সেই অনন্তের গান গেয়ে চলে যেত না, "Man thou shalt ever be for ages and ages to come; in the light of truth thy eternal Soul shall bathe; nature, thy God in thee shall be thy guide, thy priest through time shall work woe or bliss for the noble to suffer and the wise to forget."

অতীত যেটাকে কল্পনা বলে ভেবেছিল, বর্ত্তমান সেটাকে দৈববাণী বলে মেনে নিচ্ছে; আবার ভবিষ্যৎ সেটাকে সত্য বলে গ্রহণ করবে। কিন্তু এই জ্বলন্ত সত্যটুকুন হারিয়ে ফেলে আমরা একটা মিথ্যে আলেয়ার পিছু পিছু ছুটে বেড়াই; দেবতাকে পুজো করতে গিয়ে ছায়াকে আঁকড়ে ধরি। এই অন্ধ স্বভাবটাই আমাদেরকে প্রকৃতির চোখে অচেনা করে দেয়, আমাদের জীবনের ঠিক অস্তিত্বটুকুন, আমাদের আত্মার প্রকৃত উদ্দেশ্য টুকুন লুকিয়ে ফেলে, ভুলিয়ে দেয়। তাই আমরা আসল ছেড়ে নকল ভালবাসি, অকৃত্রিমকে ছুরে ফেলে দিয়ে কৃত্রিমকে বুকে জড়িয়ে নিই। নৈতিক জীবনের বিশেষত্ব টুকুন কোথায়? স্বাধীনতার মহত্ব কোথায়? ইতিহাস সভ্যতার সায় দিয়ে বলবে, "মানুষ একদিন পশু ছিল, নিজকে ছাড়া পরকে চিনত না; অপরকে বড় বলে মেনে নেওয়া, অপরের জন্য কষ্ট স্বীকার করা, অপরকে মুক্ত করে দেওয়া, এ সব কাজ প্রকৃতির বিরুদ্ধ নিয়ম বলে জানত; কিন্তু এখন শিক্ষা মানুষের চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে, জ্ঞান তাকে সব চেয়ে বড় করে তুলেছে, ধর্ম্ম তাকে স্বর্গের সিড়ি দেখিয়ে দিয়েছে; তাই মানুষ আজ অমন করে জগতের মাঝে দশজনার একজন হয়ে দাঁড়াতে শিখেছে।" কিন্তু সত্যি কি ইতিহাস মানুষের কেবল উন্নতির একটা স্মৃতি-চিহ্ন এঁকে রেখে দেয়? এই স্মৃতি-চিহ্নের ভেতর কোন কাল দাগ কি নেই? যদি না থাকত তা হলে, একই জাতির ইতিহাসে কখনও অমন করে একই কথার, একই সত্যের বার বার উল্লেখ থাকত না; তা হলে মানব জীবনের একই ভুলের অভিনয় বার বার একই ভাবে রঙ্গমঞ্চে ওরূপ স্পষ্ট করে দেখা যেত না। তাই বুঝি বিশ্ব জগতের ইতিহাস লেখক

গেয়েছেন, "No, the history of mankind never records one unerring truth that estranges a posterity to her foregoing generation but writes and writes in unmistakable colours what time endows eternity to prove. Nations do rise and crumble to dust ; civilisation walks apace till dark ages command a retreat ; there the historian gets his wages and the time-worn moth hath its portion." শিক্ষাই যদি মানুষকে বড় করে তুলত, সভ্যতাই যদি মানুষকে মহান্ উদার করে দাঁড় করত, তা হলে বিশ্ব-কবি কখনও অমন করে করুণ স্বরে গাইত না, "What man has made of man !" বিশ্ব-ভাবুক তা হলে অমন করে কেঁদে বেড়াত না, "Shades of the prison-house begin to close and we daily further from the east do travel." স্বাধীনতার বড়াই করে আমরা অপরের স্বাধীনতা কেড়ে নেই, সভ্যতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়ে অপরকে অসভ্য বলে গালাগালি দেই ; এটাই হচ্চে আমাদের কৃত্রিম জীবনের অকৃত্রিমতা, মহান্ আত্মার কপট রহস্য ! নৈতিক জীবনের যে একটা প্রকৃত মহত্ত্ব আছে, সেটা আমরা সহজে হারিয়ে ফেলি ; স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করি, দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করতে গিয়ে একটা স্বার্থপরতায় নিজকে জড়িয়ে ফেলি। যাকে আমরা আজকাল national franchise বলে থাকি, সেটা একটা দলাদলির ওজুহাত মাত্র, জাতীয় জীবনের একটা মিথ্যে অভিনয়। তা নইলে মানুষ অমন করে দেশের লোককে একটা মিথ্যে প্রলোভন দেখিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে পারত না। এখানে একটী জাতির কিম্বা একটী দেশের কোন কথা হচ্চে না। মানুষ মানুষকে অন্যায় কাজে পাগল করে তুলে, তার পর তার সমস্ত শক্তিকে একটা অমঙ্গল সাধনে নিযুক্ত করে ; বাইরে একটা মহৎ উদ্দেশ্যের ছাউনি দিয়ে জগৎকে বোঝাতে চায় এটা অমঙ্গল নয়, এটা মঙ্গল। শুধু কি তাই ? আমরা সভ্যতার নিশান উড়িয়ে দিয়ে বলতে চাই, স্বাধীনতার চেষ্টা প্রাণে জাগিয়ে দিয়ে বক্তৃতা করে বেড়াই, "এই নাও তোমার মুক্ত জীবন ; শত্রুর হাত হতে তোমায় বাঁচিয়ে দিলুম কিন্তু মনে রেখো একটী কথা ; দেখো যেন উপকারীর উপকার ভুলে যেয়ে শেষ কালে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠোনিকো।" একজন মহাপণ্ডিত বলেছেন, "A true statesman is he who can adjust his policy to the time spirit, who can buy people's favour at no serious cost, who can pretend a great deal and foresee very little the truth of things, who can speak and win the day by the valour of his tongue, who can act, weep, and smile as the exegency of the stage demands—true to the unjust and untrue to the just, always free and always without conscience."

পরকে ঠকিয়ে, পরের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে, যদি নৈতিক জীবনকে উন্নত করতে

হয়, তা হোলে সেই নৈতিক জীবনের সার্থকতা কোথায় ? কপটতার আশ্রয় নিয়ে যদি একটা মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করতে হয়, তা হোলে সেই মহত্ত্বের মহত্ত্ব রইল কোথায় ? মানুষ নিজকে এমনি সহজে ভুলাতে চেষ্টা করে যে, শেষকালটা তার সব লুকোচুরি ধরা পড়ে যায়। পরকে ঠকাতে গিয়ে নিজেই নিজকে ঠকিয়ে বসে। এমনি করে আমাদের সামাজিক জীবনেও একটা প্রকাণ্ড মিথ্যের অভিনয় নিত্যিনৈমিত্যি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেটাকে আমরা আজকাল সমাজের ভিত্তি বলে থাকি, সেটা কি সত্যি একটা ফাঁকা জিনিষ নয় ? সেটা কি একটা খোসা বই অন্য কিছু ? সমাজ গঠন শৃঙ্খলার উপর নির্ভর করে থাকে ; সেই শৃঙ্খলা প্রকৃতির সাথে লড়াই করে কখনও সৃষ্টি হতে পারে না ! আমি ঘরে বসে ভাবছি, আমার সমাজকে একটা আদর্শ করে গড়ে তুলব, কিন্তু সেই আদর্শটুকুন কোথায় ? যে আদর্শকে আমার নিজের ভেতর হতে ফুটিয়ে তুলতে পারি, সেই আদর্শকে আমি পরের নিকট হতে ধার করে নিয়ে আসি ! আমাদের শিক্ষা জিনিষটা কি ? পুঁথি-পড়া কতগুলো টিয়ে পাখীর বুলি বইত নয় ? সেগুলো কল্পনায় বেশ সুন্দর দেখায় কিন্তু বাস্তব জীবনে ঠিক খাপ খেয়ে উঠতে চায় না। কচি বয়সে শিশুরা যেমনি ধূলোর বাড়ী, ধূলোর মাঠ, ধূলোর পুকুর তৈরী করে, আমরা তেমনি জগতের দুটো কাল্পনিক আদর্শ পুঁথিতে পড়ে আয়ত্ত্বাধীন করতে চাই। শেষকালটা যখন আকাশ কুসুম হাওয়ায় ফুটে উঠে হাওয়ায়ই শুকিয়ে যায়, তখন আমরা অসম্ভবের দোহাই দিয়ে সম্ভবকে দূরে সরিয়ে রাখি।

এমনি করে নকলকে আঁকড়ে ধরে আসলকে হারিয়ে ফেলি। এখানেই যদি মিথ্যের অভিনয়টা শেষ হত, তা হোলে মানুষের মুক্তির আশা নিরাশা বলে মনে হত না। মানুষ যখন নকলকে একবার পুরোহিত বলে মেনে নেয়, তখন আসল তার সকল প্রভাব হারিয়ে ফেলে। এটা একটা রহস্য বলতে হবে, যেখানটায় জীবনের বন্যা সব চেয়ে বেশী জোরে বইতে থাকে সেই-খানটায় যেন নকলের একটু বাড়াবাড়ি দেখতে পাওয়া যায়। অবিশ্যি এটাও ঠিক কথা যে, যেখানে যত হুজুগের নেশাটা বেশী, সেখানে ঠিক সেই পরিমানে নকলের নেশাটাও বেশী। তাই আমরা মহানগরীর বুকের ভেতর কেবল একটা কৃত্রিমতার উপহাস দেখতে পাই। একজন উপন্যাস লেখক লিখেছেন, "Where art steps in, nature dies. Man would feign call his own working nature's witchery. All that we do in the name of truth is no truth but its shadow ; our smiles and tears are but empty bubbles that mock the spirit that is in the air, the soul that is in nature, the god that is in man ; all is mockery, untruth and hypocrisy compact." পরের দুঃখ দেখে আমার প্রাণ কাঁদছে না, তবু আমায় জোর করে দু ফোঁটা চোখের জল ফেলতে হবে ; আমার প্রাণ ভরে হাসি আসছে না, তবু আমায় অপরকে খুসী করবার জন্য মুখ ফুটে হাসতে হবে। এই যে একটা

অস্বাভাবিক অভিনয়ের মস্ত আয়োজন, এটাই আমাদেরকে প্রকৃতি হতে অনেক দূরে সরিয়ে নেয়। যাঁরা আজকালকার জীবনস্রোতে একবার ডুব দিয়ে দেখেছেন তাঁরা এই অকৃত্রিমতার সার্থকতা বুঝতে পেরেছেন। বাপ-মা ছেলে-মেয়েকে ভালবাসবেন, স্নেহ করবেন, সেটাও যেন একটা ধার-করা জিনিষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলের পুতুল যেমনি একটা অন্ধ নিয়ম মেনে কাজ করে যায়, আমরাও তেমনি আজকাল সব জায়গায় একটা অর্থশূন্য প্রাণহীন অন্ধ নিয়ম মেনে চলতে চাই। যেন আমাদের জীবনের কোন সার্থকতা নেই, কর্ত্তব্যের কোন উদ্দেশ্য নেই। অসার নির্জ্জীব গাছ-পাথরের মত ঘুরে বেড়াই, ব্যস্ততার একটা তীব্র নেশা জাগিয়ে দিয়ে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিই। আমাদের জীবনটা কি একটা ধূলো খেলা? শুধু ধার-করা, জোর-করা, নকল-করা একটা অন্ধ নিয়মের গতি? আমরা কত আশার প্রদীপ জ্বেলে, কত আকাশ-কুসুম তৈরী করে, সমাজের সাথে একটা কাল্পনিক প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করি; সেই প্রতিযোগিতার ভেতরেই আমাদের ইহকাল, আমাদের পরকাল। সেই রেশারেশির ভেতরেই আমাদের জীবনের বিকাশ।

এমনি করে প্রকৃতির সাথে লড়াই করে নিজের শরীরকে নিজেই ক্ষতবিক্ষত করে কতদূর অগ্রসর হতে পারব? যে ধর্ম্মজীবনের বড়াই করে আমরা পৃথিবীর কাছে মাথা উচু করে প্রচার করছি, "ওগো জীবন পথ যাত্রী! বিশ্ব-প্রেম আমাদের চরম সাধনা, আমাদের অনন্ত মুক্তি; অনন্ত আত্মার আলো আমাদের জীবাত্মার ভেতর দিয়ে ফুটে উঠবে; ভক্তি, প্রেম, ভালবাসা, অসত্যকে সত্য করে তুলবে, মৃত্যুকে অমৃত করে তুলবে; সংসার সন্ন্যাসী প্রকৃত দেবতা, ধর্ম্মজীবনের মূর্ত্তিমান পুরুষ, অনন্ত পরমাত্মার জ্বলন্ত প্রকাশ ও পরিণতি।" কিন্তু আমরা যদি একবার ভেবে দেখি আমাদের ধর্ম্ম-জীবন আমাদেরকে কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে, সমস্ত শরীরটা তখন শিউরে উঠবে। তাই একজন ধর্ম্মযাজক বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "We preach and preach our hearts out. The gospels that we read in the holy book of God we believe for a moment in their eternal truth; we revere not their holy memory when we lose our all in the whirl pool of life. We pray because our hearts are as dry as dust. We fill our eyes with tears and never leave the sacred floor until the stars weep themselves into dew; but lo! how our nature yields to a change quicker than the wings of full contrition can overtake a change indeed that forgets all sighs and tears and leaves no memory behind!" এমনি করে যদি আমাদের ধর্ম্মজীবনের সারটুকুন হারিয়ে ফেলতে হয়, তা হলে আমাদের নিজের বলতে রইল কি? জীবনের যেটা অতুল সম্পত্তি, জগতের যেটা সবচেয়ে মূল্যবান জিনিষ, সময়ের যেটা অমূল্য পুরস্কার সেটা একটা নকলের ধাঁধাঁয় পরে ধূঁয়ো হয়ে মিলিয়ে যাবে, এটা মানুষ কখনো মানুষ হয়ে সইতে পারবে না। অতীত তা হলে উপহাস করে বলবে, "যাকে তুমি দৈববাণী বলে মনে

করেছিলে সেটা শুধু আঁধারের একটা প্রতিধ্বনি।" বর্ত্তমান একটা দীর্ঘনিশ্বাস টেনে বলবে, "যাকে তুমি ধ্রুবতারা মনে করে অনন্তের দিকে ভেসে যাচ্ছ, সেটা একটা আলেয়ার আলোছায়া!" ভবিষ্যৎ একটা অনন্ত আঁধারের আড়াল থেকে উত্তর দেবে, "জীবনটা একটা মিথ্যে অভিনয়, জগৎটা একটা ফাঁকা জিনিষ, প্রকৃতি একটা জুয়োচুরি!"

পাষাণে শৈবাল

(শ্রীশিবদাস)

পাষাণের বুকে শৈবাল শ্যামল
মরি কি সুন্দর অই—
ক্ষুদ্র শষ্প-শিশু হাসে খল্ খল্
পাষাণ বক্ষ আলো ঝলমল্
চোখ ভরে দেখে লই।

মলয় সোহাগে পাষাণ দোলায়
দোল দিয়ে ধীরে এদেরে খেলায়
দোলে এরা, কিবা শোভা হায়!
দেখ আঁখি ভরি—আঁখি আছে যার,
দেখহে পথিক! দৃশ্য একবার,
সদাই এমন দেখা নাহি যায়।

কারা এরা পাষাণের বুকে ফুটি রয়?
পাষাণ এদের মুখে কিবা কথা কয়?
পাষাণের পাথর প্রাণে কথা জাগে
মৌন মুখ, তাই বুঝি ভাষা মাগে
ক্ষুদ্র শষ্প শিশুর কম্পিত অধরে,
তটিনী যেমন পাহাড়ের বুকে
পাথরের কান্না কাঁদে গীতিমুখে
উছলি যুগের সঞ্চিত ব্যথাভরে!

বাহিরে জগৎ চঞ্চল চপল,
প্রেম গীতি ভরা—আনন্দবিহ্বল,
শত মুখে তার উৎসব গান,
যুগ যুগ ধরে সেই শুধু হায়
উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ-ভরা বেদনায়
ধ্রুব আবেগ—মৌন পাষাণ।

চারিদিকে তার শ্যামলিত ধরা
মাটীর বুকের কোমলতা ভরা
তারি মাঝে সেই শুধু কঠিন পরাণ
যুগের পেষণে পিষ্ট পাথর পাষাণ।
এ নহে পাষাণ—পাথর পরাণ
(তার) হিয়া গাহে আজো সবুজের গান,
গেয়েছে অমনি চিরদিন সে,
যুগের উত্তাপ দেহটারে তা'র
পুড়ে পুড়ে শুধু করেছে পাথর
পুড়েনি পরাণ, বুকের রসে।

পাথরের বুকে তাই শ্যামলতা
চঞ্চল রুধির, স্নেহ কোমলতা
আছে সবি, ছিল মাটিতে যেমন;

পাথর বুকের প্রাণের রোদন
আলোতে ফুটিতে শত আকিঞ্চন,
শৈবালদল তারি নিদর্শন।

পাষাণ তাহার অতীত স্মৃতিরে
মূর্ত্ত করেছে শুষ্ক রুধিরে
পাষাণ বাঁধন টুটে বা পাছে,
ধ্বংস করো না এরে, হে নির্দ্দয়!

মূকের মুখর গীতিকা এ নয়
শুধু আব্‌দার তোমাদের কাছে।

মুখরের কাছে মূকের বেদন,
গোপন পরাণে নীরব ক্রন্দন—
তারি দুই ফোঁটা ঝরা অশ্রুজল
পাষাণের বুকে শৈবাল শ্যামল।

দুই বন্ধু

(শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য)

তাদের একজনের নাম ছিল খোঁড়োরাম; আর একজনের নাম ছিল ইচ্ছারাম। তাদের ব্যবসা ছিল চুরি করা। সহরতলির এক অতি জঘন্য বস্তির ভিতর তারা থাকিত। সেখান হইতে তাহারা আশেপাশে গ্রামগুলিতে চুরি করিতে যাইত; কারণ, সহরের ভিতর চুরি করা খুব শক্ত, আর তাদের নিজপাড়ায় চুরি করার মত কাহারও কিছু ছিল না। তাহারা খুব অল্পেই সন্তুষ্ট হইত। একখানা কাপড়, কি একটা হাঁস—এর বেশী চুরি করিত না। কিন্তু এত নির্লোভ হইলেও তাহারা পুলিশের সন্দেহ এড়াইতে পারে নাই। পুলিশের লাঠীর সহিতও তাদের অনেকবার পরিচয় হইয়াছিল।

খোঁড়োরামের বয়স ছিল প্রায় চল্লিশ। সে যেমন লম্বা তেমনই জোয়ান। হাঁটিবার সময় সে বুকটান করিয়া হাঁটিত। বাঁ পা টা একটু বেঁটে ছিল; এই জন্যই বাপ মা তার নাম দেয় খোঁড়োরাম। ইচ্ছারাম তার চেয়ে অন্তত পাঁচ বৎসরের ছোট, এবং তাহার মত জোয়ানও নয়। তাহার আবার ছিল কাশির ব্যারাম। হাঁটার সময় শিষ্ দিয়া গান গাওয়া তাহার একটা অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দুইজন সব সময় একত্র থাকিত। চাষারা তাহাদিগকে দেখিলেই বলাবলি করিত, ঐ রে, দুই শয়তান আসিতেছে। ওদের মাথা দুইটা গুঁড়া করিয়া দিলে হইত।"

একে পুলিশের নজর, তাতে আবার অন্য লোকেরও তাদের উপর এই ভাব, কাজেই তারা পথে ঘাটে অতি সাবধানে চলাফেরা করিত—পাছে কাহারও সঙ্গে দেখা হয়। ইচ্ছারাম

কাশিত এবং গান করিত; আর তাহার বন্ধু খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া তাহার পাশে চলিত। কখনও বা কোন জঙ্গলের কিনারায় শুইয়া কোথায় কি চুরি করিবে, দুই বন্ধু ইহাই পরামর্শ করিত।

শীত আসিলে দুই বন্ধুর অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিত। প্রায় সন্ধ্যার সময় তাহারা পুলিশের দৃষ্টি এড়াইয়া সহরে ভিক্ষা করিয়া ফিরিত। সব দিন ভিক্ষাও মিলিত না। কাজেই সময় সময় উপবাসও করিতে হইত। ফলে তাহারা ক্রমেই জীর্ণ হইয়া পড়িত। শীতের অবসানের জন্য দুই বন্ধু উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিত। অবশেষে বসন্ত আসিলে ক্ষুধায় শীর্ণ দুই বন্ধু তখন কোথায় কিরূপে চুরি করিয়া আহার সংগ্রহ করিবে সেই ভাবনায়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িত। কখনও বা তাহারা মাঠের ভিতর যাইয়া জাল পাতিয়া ছোট ছোট পাখী ধরিত। সেগুলি বিক্রী করিয়া সেই পয়সা দিয়া নিজেরা কিছু কিনিয়া খাইত। কখনও বা জঙ্গল হইতে নানাপ্রকার ফল কুড়াইয়া তাহাই বিক্রী করিত। এই ভাবে দুই বন্ধু কোন রকমে বাঁচিয়াছিল।

সে একবারের কথা, তখন মাত্র ফাল্গুন মাসের আরম্ভ; তখনও সব গাছে নূতন পাতা ধরিতে আরম্ভ করে নাই। পৃথিবীর নূতন সাজ তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। সে'বার শীতটা একটু বেশী পড়িয়াছিল। অনেকদিন শীত ভোগের পর আজ দুই বন্ধু মুখে বিড়ী জ্বালাইয়া রাস্তা দিয়া চলিয়াছে। দুইজনে আলাপ করিতেছিল। খোঁড়োরাম একটু বিরক্ত-স্বরে তাহার সঙ্গীকে বলিল, "তোমার কাশিটা দেখি দিন দিন খারাপের দিকে যাইতেছে।"

"ও কিছু নয়; ঠিক্ দেখিও, রোদে একটু গরম হইলেই আমি ভাল হইয়া যাইব।"

"তা বটে! কিন্তু, একবার হাঁসপাতালে যাও না কেন?"

"না ভাই! হাঁসপাতালে যাইয়া কি হইবে। আমি মরিলে এখানেই মরিব।'

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া খোঁড়োরাম আবার বলিল, "তুমি কিন্তু ভালরূপে "হাঁটিতে পারিতেছ না।"

"সেটা কেন জান? আমার এই বাতাসে শ্বাস নিতে যেন কষ্ট হয়।"—ইচ্ছারাম এইটুকু বলিয়াই কাশিতে আরম্ভ করিল।

খোঁড়োরাম তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। কাশি থামিলে পর ইচ্ছারাম বলিল, "উঃ, কশিবার সময় যেন বুকটা ছিঁড়িয়া যাইতে চায়।" দুইজনে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইল। হঠাৎ খোঁড়োরাম বলিল "ওহে, সাম্‌নে একটা গ্রাম দেখা যাইতেছে। ওর ভিতর দিয়া না যাইয়া চল একটু ঘুরিয়া যাই। হয়ত, কিছু শিকারও জুটিয়া যাইতে পারে।"

রাস্তার বাঁ পাশ ধরিয়া ছিল একটা জঙ্গল। রাস্তা ছাড়িয়া তাহারা সেই জঙ্গলের পাশ দিয়া চলিতে লাগিল। কিছু দূর গিয়া দেখিল যে একটা অতি শীর্ণকায় ঘোড়া ঘাস

খাইতেছে। ঘোড়াটাকে দেখিবামাত্রই দুই বন্ধু থামিল। অনেকক্ষণ ঘোড়াটার দিকে তাকাইয়া ইচ্ছারাম বলিল, "দেখ্‌ছ ভাই, ঘোড়াটাও আমাদের মত খাইতে পায় না।" খোঁড়োরাম আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল," ওহে চুপ্‌ কর। শোন, ঘোড়াটাকে যদি বেঁদেদের নিকট বিক্রী করি, তা হইলে অন্ততঃ ত্রিশ টাকা পাওয়া যাইবে।"

ইচ্ছারাম বলিল," দূর, ওর ত গায়ে কেবল হাড় আর চামড়া। ত্রিশ টাকা না আরও কিছু দিবে।"

"আরে বোকা, যা হয় কিছু ত দিবে। কথায়ই ত বলে,'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল'।"

"তা সত্য, কিন্তু ঘোড়াটাকে নিলে মাটিতে পায়ের দাগ থাকিবে যে" ?

"পায়ের নীচে কাপড় জড়াইয়া নিলেই চলিবে। এখন ঘোড়াটাকে নিয়া জঙ্গলে বাঁধিয়া রাখি। রাত্রে বেশ অন্ধকার হইলে পর বেঁদেদের নিকট লইয়া যাইব"।

চারিদিকে একবার বেশ ভাল করিয়া তাহারা দেখিয়া লইল। তারপর ইচ্ছারামের কাপড়ের একটা অংশ ছিঁড়িয়া ঘোড়াটার পা মুড়িয়া উহাকে লইয়া তাহারা জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিল। সেখানে ঘোড়াটাকে একটা গাছে বাঁধিয়া রাখিল; ঘোড়াটা একবার তাহাদের দিকে তাকাইয়া আবার ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল।

জঙ্গলের ভিতরটা যেমন অন্ধকার তেমন ঠাণ্ডা। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। তাহারা একটা আগুন জ্বালাইয়া সেটার পাশে বসিল। অনেকক্ষণ তাহারা এই ভাবে বসিয়া রহিল। ইচ্ছারাম মধ্যে মধ্যে শিষ্‌ দিয়া গান গাহিতেছিল। খোঁড়োরাম ডালপালা কুড়াইয়া আগুনে দিয়া আগুনটা সতেজ রাখিতেছিল। ইচ্ছারামের গান গাছের পাতার শব্দের সঙ্গে মিশিয়া একটা করুণ সুরের আভাস জাগাইতেছিল।

হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ইচ্ছারাম বলিয়া উঠিল, "কি হে, এখন যাইবে!"

"এখনও ভাল করিয়া অন্ধকার হয় নাই। আর একটু পরে যাইব।"

ইচ্ছারাম একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কাশিতে আরম্ভ করিল। অনেকক্ষণ পরে তাহার সঙ্গী জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে, ঠাণ্ডা লাগিতেছে?"

"না ভাই, আমার একটা কথা মনে পড়িতেছে।"

"কি!"

ইচ্ছারাম হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "দেখ ভাই, আমি কি ভাবিতেছি জান? যখনই ঘোড়াটার দিকে তাকাই তখনই মনে হয়, আমারও এ রকম একটা ঘোড়া ছিল। একটা কেন? আমার দুই দুইটা ঘোড়া ছিল। তখন আমি নিজে চাষ করিয়া খাইতাম। আঃ, তখন কি সুখের দিনই ছিল!"

খোঁড়োরাম একটু বিরক্তভাবে বলিল, "তুমি এ সব কি বকিতেছ? আমি ও সব পছন্দ করি না।" ইচ্ছারাম চুপ করিয়া আবার ঘোড়াটার দিকে তাকাইয়া রহিল।

খোঁড়োরাম কঠিন সুরে বলিয়া যাইতে লাগিল, "দেখ, জীবনটা কিছুই নয়। তোমার কথাগুলি আমার মোটেই ভাল লাগে না। তোমার অসুখ বলেই এ রকম কথা মনে হয়।"

অনেকক্ষণ তাহারা চুপ করিয়া রহিল। হঠাৎ ইচ্ছারাম একটু নড়িয়া উঠিল। তাহার দুই চোখ দিয়া যেন একটা ঈপ্সিত জিনিষ দর্শনের আনন্দ ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

খোঁড়োরাম একটু অসন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি হইয়াছে?" ইচ্ছারাম দোষীর ন্যায় উত্তর দিল, "আমার একটা পুরাণ কথা মনে পড়িল।"

"কি?"

"সে ও প্রায় এই রকমই। আমার প্রতিবেশীরও একবার এ রকম একটা ঘোড়া চুরি যায়। ঘোড়াটা মাঠে ঘাস খাইতেছিল। আর তার কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না। যখন সে ঘোড়াটা চুরি যাওয়ার কথা শুনিল, তখন সে যে রকম কাঁদিল—মনে হইল যেন তার সর্ব্বস্ব হারাইয়াছে। অনেক দিন সে কেবল কাঁদিতই—"

"ও কথা তোমার মনে হইল কেন?"

থতমত খাইয়া ইচ্ছারাম বলিল, "অমনি।" খোঁড়োরাম খুব কঠিন সুরে বলিল—"দেখ, তোমার কথার কোন অর্থ নাই।" ইচ্ছারাম মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল," তা বটে! তবে একটু কষ্ট হয়—"

"কষ্ট হয়! হা ভগবান্, আমাদের জন্য কারও কখন কষ্ট হয়?"

"তোমার কথা বুঝিলাম না"।

"থাক্, চল এখন যাইতে হইবে।"

"এখনই?"

"হঁা।"

ইচ্ছারাম একটু চুপ করিয়া থাকিয়া খোঁড়োরামের দিকে চাহিয়া একটু নরম সুরে বলিল, "ঘোড়াটাকে ছাড়িয়া দিলে হয় না?"

খোঁড়োরাম রাগিয়া বলিল, "এটা তোমার মত ছোট লোকের উপযুক্ত কথাই বটে," ইচ্ছারাম আরও নরম সুরে বলিল, "না ভাই শোন! এতে অনেক বিপদ আছে। ধর, বেঁদেরা যদি না কিনে? তা হইলে কি করিবে?"

"সে তখন বুঝা যাইবে।"

"তোমার যা ইচ্ছা, তবে ছাড়িয়া দিলেই ভাল হয়। ঘোড়াটা ওর মালিকের নিকট ফিরে যাক্।

খোঁড়োরাম চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। রাগে তাহার শরীর কাঁপিতেছিল। ইচ্ছারাম আবার বলিল, "এর জন্য কতই বা পাওয়া যাইবে! চল, এটাকে অন্ধকারে ছাড়িয়া দিয়া আমরা ফিরিয়া যাই। হয় ত, রাস্তায় অন্য কিছু মিলিলে মিলিতেও পারে।"

হঠাৎ খোঁড়োরাম বলিয়া উঠিল, "আর কতক্ষণ তুমি বক্‌বক্ করিবে শুনি?"

"আমার উপর রাগ করো না ভাই। ভগবানের দোহাই, ঘোড়াটাকে ছাড়িয়া দাও। ওর মালিক নিশ্চয়ই খুব দুঃখ পাইবে। ঘোড়াটাকে ছাড়িয়া দেওয়াই ঠিক্।" খোঁড়োরাম চীৎকার দিয়া উঠিল, "তুমি কি আজ নেশা করিয়াছ?"

"না"।

"তা হ'লে তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত। এটাকে ছাড়িয়া দিলে আজ কি খাইব? আমি এত দয়াধর্ম্মের ধার ধরিনা — * * * — তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। কিন্তু জানিও এ রকম করিলে তোমার সঙ্গে আমার পোষাইবে না।"

ইচ্ছারাম একবার কাশিয়া ঘোড়াটার দিকে অগ্রসর হইল। খোঁড়োরাম তাহার সঙ্গীকে ঘোড়াটা ছাড়িয়া দিতে দেখিয়া রাগে ফুলিতেছিল। 'চল যাই"—এই বলিয়া সে অগ্রসর হইল। ইচ্ছারাম তাহার পাছে পাছে সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া চলিল।

অনেকক্ষণ তাহারা কোন কথাবার্ত্তা না বলিয়া এই ভাবে চলিল। হঠাৎ ইচ্ছারাম আস্তে আস্তে বলিল, "আমার শরীরটা ভারী খারাপ লাগিতেছে।"

খোঁড়োরাম ঠাট্টার সুরে জিজ্ঞাসা করিল, "ভারি খারাপ? কি রকম?"

"শ্বাস ফেলিতে আমার খুব কষ্ট হইতেছে।"

"কেন?"

"বোধ হয় আমার কোন অসুখ করিয়াছে।"

"মিথ্যা কথা। তুমি আহাম্মক তাই তুমি নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিতেছ না।"

"তা হবে—"

ইচ্ছারাম হয় ত আরও কিছু বলিত কিন্তু সে একটা গাছে হেলান দিয়া কাশিতে আরম্ভ করিল। এবার অনেকক্ষণ কাশিল। খোঁড়োরাম তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কাশিতে কাশিতে সে মাটিতে বসিয়া পড়িল। বলিল, "তুমি যাও, আমি এইখানেই একটু বিশ্রাম করি। আমি আর হাঁটিতে পারিতেছি না। আমার মাথা ঘুরিতেছে।"

খোঁড়োরাম একটু বিরক্ত ভাবে বলিল, "চল, আর একটু যাওয়া যাক্"।

"না, আমার গায়ে আর একটুকও জোর নাই।"

"তা না থাকারই কথা। কাল হইতে এ পর্য্যন্ত আমরা কিছু খাই নাই।"

"না—তা নয়, দেখ—রক্ত"—ইচ্ছারাম এই বলিয়া তাহার হাতটা খোঁড়ারামের দিকে অগ্রসর করিয়া দিল। খোঁড়োরাম জিজ্ঞাসুনেত্রে তার দিকে তাকাইয়া আস্তে আস্তে বলিল, "কি করা যায়?"

"তুমি যাও। আমি এখানে থাকি। একটু বিশ্রাম করিয়া পরে যাইব।"

"কোথায় যাইব! আচ্ছা, গ্রামে যাইয়া বলি যে জঙ্গলে একটা লোক অসুখ হইয়া পড়িয়া আছে!"

"না ভাই, তা হইলে আমাদের দুইজনকেই মারিয়া ফেলিবে।"

ইচ্ছারাম শুইয়া পড়িল। একটু কাশিতেই মুখ হইতে এক ঝলক রক্ত বাহির হইল। তাহার বুকের ভিতর একটা শব্দ হইতেছিল। চোখ বসিয়া গিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে মুখ হইতে রক্ত বাহির হইতেছিল।

খোঁড়োরাম খুব আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "এখনও কি রক্ত পড়িতেছে!" ইচ্ছারামের মুখ বিকৃত হইয়া উঠিল। একটা অতি অস্পষ্ট শব্দ শোনা গেল "হঁা"।

খোঁড়োরাম হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। শুনিতে পাইল, অতি ক্ষীণ কণ্ঠে ইচ্ছারাম বলিতেছে, "ভাই আমার মরণ ঘনাইয়া আসিয়াছে।" সে কাঁপিয়া উঠিল। তারপর হাঁটু হইতে মাথা তুলিয়া খুব মৃদুস্বরে বলিল, "না ভাই, ভয় পাইওনা। এ অসম্ভব, এ কিছুতেই হইতে পারে না;—ভগবান তোমাকে রক্ষা করিবেন। একটু চুপ করিয়া থাক। তুমি ভাল হইয়া যাইবে।"

ইচ্ছারাম আবার কাশিতে আরম্ভ করিল। তাহার বুকের মধ্যে এবার একটা নূতন শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। কাশি থামিলে সে অনেকক্ষণ ঘন নিঃশ্বাস গ্রহণ করিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল যেন সে কোথায়ও দৌড়াইয়া চলিয়াছে। অনেকক্ষণ পর সে বলিল, "ভাই আমাকে ক্ষমা করিও..... ঘোড়াটা......যদি কোন অন্যায় করিয়া থাকি ... ..ক্ষমা করিও ভাই আমার।"

খোঁড়োরাম তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "তুমি আমাকে ক্ষমা করিও।" একটু পরে সে আবার বলিয়া উঠিল, "আর আমি! আমার কি হইবে! আমি কোথায় যাইব!"

"ভগবান্ তোমাকে শান্তি..."—ইচ্ছারাম আর কথাটা শেষ করিতে পারিল না। তাহার গলার মধ্যে একটা ঘর ঘর শব্দ আরম্ভ হইল। দু একবার এপাশ ওপাশ করিল। খোঁড়োরাম তাহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। এইরূপে কিছুক্ষণ কাটিল।

হঠাৎ ইচ্ছারাম মাথাটা একবার একটু উঠাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তখনই আবার উহা মাটিতে পড়িয়া গেল।

তাহার মুখের নিকট মুখ নিয়া খোঁড়োরাম জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাই!"—কিন্তু বন্ধু আর কোন উত্তর দিল না। সেইখানেই অচল অবস্থায় পড়িয়া রহিল।

খোঁড়োরাম উঠিল। নীরবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া দৃঢ়পদে অগ্রসর হইল। মনে হইল যেন কোন অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সে পৃথিবীর বুকের উপরে লাথি মারিতেছে।

তখন ভোর হইয়া আসিয়াছে। চতুর্দ্দিক তখনও নিস্তব্ধ। পাশেই একটা নদী তাহার চিরন্তন কুলু কুলু ধ্বনি দ্বারা সেই নিস্তব্ধতা আরও গভীর করিয়া তুলিতেছিল।*

কর্ম্ম ও জ্ঞান

(শ্রীমন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য)

বৈদিক সাহিত্য ও পরবর্ত্তী হিন্দুশাস্ত্রে সামাজিক জীবন ও ভাবের দুইটী বিশিষ্ট ধারা লক্ষিত হয়। জ্ঞানজীবন ও কর্ম্মজীবনের ধারা—এই দুইটী অতি প্রাচীন কাল হইতে কখনো বা কখন নানা বিরোধিতার ভিতর নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস এই দুইটী বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। সামাজিক জীবনের উপরও ইহাদের প্রভাব কম ছিল না। কর্ম্মজীবনের উপাসক গৃহস্থ সাজিয়াছেন; পক্ষান্তরে জ্ঞানবাদী সংসারধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া গিরিগুহা অথবা নিভৃত কানন আশ্রয় করিয়াছেন। ভারতীয় জীবনে দার্শনিক মতবাদ যে-পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার তুলনা বিশ্বদর্শনের ইতিহাসে বিরল। আমাদের দর্শনের এই practical aspect সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্তও তেমন ভাবে কোন আলোচনা হয় নাই, কিন্তু তাই বলিয়া ইহা উপেক্ষা করিবার বস্তু নহে।

সংহিতা ও ব্রাহ্মণে কর্ম্মবাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কর্ম্মযোগ বেদোক্ত ধর্ম্ম। দৈবশক্তি ও অমরত্ব লাভের উপায় স্বরূপ কর্ম্মজীবন বেদের ঋষির সম্মুখে আদর্শ জীবনরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। জ্ঞানজীবনের আদর্শ আরও পরবর্ত্তী যুগের। কর্ম্মজীবনই ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্যের প্রথম আদর্শ। শুধু আমাদের দেশে নয়, ইউরোপেও কর্ম্মের আদর্শ প্রথম উদ্ভূত হইয়াছে। জাতীয় জীবনে যদি কর্ম্মের আদর্শ প্রথম লক্ষিত হইয়া থাকে তাহার হেতু এই যে, ব্যক্তিজীবনেও জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্ব হইতেই কর্ম্মজীবনের স্ফূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। শিশুর কর্ম্মজীবন জ্ঞানের অপেক্ষা করে না, জ্ঞানবিকাশের পূর্ব্ব হইতেই তাহাকে কর্ম্মের ভিতর দিয়া দেহরক্ষা করিয়া পরিবর্দ্ধিত হইতে হয়।

বেদোক্ত কর্ম্মের আদর্শ প্রথম অবস্থায় বিশেষ সরল ও আনন্দময় দেখিতে পাই। হোমারের 'ইলিয়ড' নামক প্রাচীন গ্রীক মহাকাব্যে যে বিরাট আনন্দপূর্ণ জীবনের মনোজ্ঞ দৃশ্য পাওয়া যায়,

* ম্যাক্সিম্ গর্কির একটী গল্পাবলম্বনে লিখিত।

সংহিতা সাহিত্যেও তেমনি একটা আনন্দ ও জীবনোচ্ছ্বাসের ছবি সর্ব্বত্রই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। ক্রিয়ানুষ্ঠানের যথেষ্ট প্রাচুর্য্য ছিল কিন্তু সেগুলি তখন পর্য্যন্ত তেমন জটিল ও দুর্ব্বোধ হইয়া দাঁড়ায় নাই যাহাতে ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে যাইয়া যজমানের প্রাণের যোগ বিলোপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু ব্রাহ্মণ যুগে সংহিতার সরল কর্ম্মজীবনের উপর বিধি নিষেধের প্রকাণ্ড ভার চাপিয়া বসিয়া জীবনকে নিতান্তই দুর্ব্বহ ও নিরানন্দ করিয়া তুলিল। ব্রাহ্মণোক্ত যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মের ভিতর এই mechanical character স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। শত সহস্র নিয়মের কঠিন বাঁধনে পড়িয়া কর্ম্মীর প্রাণ উদ্দেশ্যকে বিস্মৃত হইয়া অনেকটা যন্ত্রচালিতের মত কাজ করিয়া চলিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত ব্রাহ্মণসাহিত্যে প্রচুর পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণোক্ত এই কর্ম্মবাদ পরবর্ত্তী মীমাংসা দর্শনে আসিয়া উহার স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করিয়াছে। মীমাংসকেরা ফলপ্রসূ কর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়াছেন। ধর্ম্ম কি, এই জিজ্ঞাসার উত্তরে মীমাংসাসূত্রকার ধর্ম্মের যে পরিভাষা দিয়াছেন তাহাতে "স্বর্গকামো যজেত, পুত্রকামো যজেত" প্রভৃতি প্রেরণামূলক বৈদিক বিধিকেই ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। মীমাংসকের মতে "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ"। [পূর্ব্ব মীমাংসাসূত্র, ২য় অধিকরণ] কর্ম্মবাদের পরিণতি বলিয়া যাহা বুঝায় তাহা মীমাংসাসূত্রে আসিয়াই থামিয়া যায়। স্মৃতি ও পুরাণে কর্ম্মবাদের বিশেষ কোন পরিণতি (development) হয় নাই; অন্যান্য আদর্শের ছবির সঙ্গে কর্ম্মের ছবিও শুধু রক্ষিত হইয়াছে মাত্র। স্মৃতি ও পুরাণ দর্শনশ্রেণীর গ্রন্থ নহে, কর্ম্মবাদ বা জ্ঞানবাদকে বিশেষ কোন পরিণতির ধারায় লইয়া যাইতে তাহারা কোনই সহায়তা করে নাই। কিন্তু স্মৃতিতে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের যে ভূয়সী প্রশংসা লক্ষিত হয় এবং পুরাণে কর্ম্মাদর্শের যে ছবি রহিয়াছে তাহা হইতে এই সত্যটা আমাদের উপলব্ধি হয় যে, স্মৃতি ও পুরাণের যুগেও সামাজিক জীবনের উপর কর্ম্মের প্রভাব লুপ্ত হয় নাই। আজ পর্য্যন্তও হয়ত কর্ম্মবাদ আমাদের জীবন ও চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। হিন্দু গৃহস্থ যে-আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সংসার ধর্ম্ম পালন করেন তাহা কর্ম্মের আদর্শ। হিন্দুজীবনে এখনও বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্মের মূল্য রহিয়াছে। যাগ যজ্ঞের ঘটা আর্থিক ও অন্যবিধ কারণে কমিয়া আসিলেও একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। জাত, উপনয়ন, বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি বৈদিক সংস্কার আজিও হিন্দুসমাজে প্রচুর নিষ্ঠার সহিত আচরিত হইয়া থাকে।

কর্ম্মের আদর্শ যেমন আমাদের একটি বিশিষ্ট প্রাচীন আদর্শ, জ্ঞানের আদর্শও ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে তেমন সুপ্রাচীন না হইলেও আরণ্যকসাহিত্য ও উপনিষদের ভিতর পরিস্ফুট হইয়া বেদান্তসূত্র ও বিশেষভাবে শঙ্করদর্শনে পরিণতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণযুগে কর্ম্ম যখন শূর্ণগর্ভ বাহ্যতায় (Externalism) পর্য্যবসিত হইল, ভারতীয় ভাবজীবনে এক নূতন অপূর্ণতার বেদনানুভূতি জাগিয়া উঠিল। অন্তঃসারহীন

কর্ম্মবাদের প্রতি অসন্তুষ্টি আরণ্যকসাহিত্যে কতক পরিমাণে প্রকাশ পাইয়া উপনিষদে বিরাট প্রতিবাদের আকারে আসিয়া দেখা দিল। জ্ঞানবাদী উপনিষদ ও কর্ম্মবাদী বেদোক্ত ধর্ম্মের ভিতর যে বিরোধ তাহা উপনিষদে এমনি স্পষ্টভাবে ফুটিয়াছে যে ভুল হইবার নয়। কঠোপনিষদে কর্ম্মলব্ধ ফলকে প্রেয় the pleasant) এবং জ্ঞানলব্ধ ফলকে শ্রেয়ঃ (the good) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। আরও দেখিতে পাই, জ্ঞানবাদকে বিদ্যা এবং কর্ম্মবাদকে অবিদ্যা নামে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। মুণ্ডকোপনিষদেও তেমনি 'পরাবিদ্যা' ও 'অপরা বিদ্যা', এই দুই প্রকার বিদ্যার অবতারণা করিয়া "দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী" বলিয়া কর্ম্মবাদের হীনতা দেখান হইয়াছে। কর্ম্মবাদের বিরুদ্ধে উপনিষদীয় জ্ঞানবাদের প্রতিবাদ (protest) এতই পরিষ্কার যে উপনিষদীয় চিন্তাধারার স্বরূপকে প্রতিবাদমূলক (protestant character) বলা যাইতে পারে। এই বিদ্রোহী চিন্তাধারার সহিত পঞ্চদশ শতাব্দীর ইউরোপের Renaissance আন্দোলনের তুলনা করা অসঙ্গত হইবে না। মার্টিন লুথারের Reformation আন্দোলনও অনেকটা এমনি ভাবের। কিন্তু এস্থানে একটী কথা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে—প্রথম হইতেই উপনিষদোক্ত জ্ঞানবাদ কর্ম্মের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহাকারে প্রকাশ পায় নাই; প্রথম অবস্থায় উহা কর্ম্মবাদের পরিপূরক (supplement) হিসাবেই আসিয়াছে। ক্রমে তাহা বিদ্রোহে পরিণত হইয়াছে। উপনিষদ-বারিধি মন্থন করিয়া প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ (orientalist) অধ্যাপক পল দয়সেন (Paul Deussen) ও অধ্যাপক রাধাকিসৃনন্ যে অমূল্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে এই বিষয়টীর সম্যক্ আলোচনা হয় নাই; এ সম্বন্ধে তাঁহাদের মত কি তাহা গ্রন্থ হইতে বুঝা যায় না। আমাদের মনে হয় ব্রহ্মবিদ্যা প্রথমতঃ কর্ম্মবাদের পরিপূরকরূপেই প্রকাশ পাইয়াছে, ক্রমে উহা প্রতিবাদ বা বিদ্রোহের আকারে পরিণতি লাভ করিয়াছে। উপনিষদের ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য কেবলমাত্র জ্ঞানবাদী ছিলেন না, তাঁহাকে কর্ম্মীর বেশেও আমরা দেখিতে পাই। প্রথম অবস্থাতেই কর্ম্মবাদের সহিত সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ সাধিত হয় নাই, কালক্রমে সেই বিচ্ছেদ পূর্ণ ও সার্থক হইয়াছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদের ৩য় অধ্যায়ে দেখিতে পাই যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি জনকরাজার প্রাসাদে একটী বিরাট যজ্ঞে আহূত হইয়া আসিয়াছেন। যথাবিধি যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইবার পর, যাজ্ঞবল্ক্য ও অন্যান্য ঋষিগণ ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কেবল বৃহদারণ্যকে নয় অন্যত্রও বৈদিক কর্ম্মের উল্লেখ প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। ইহা হইতে আমাদের এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে উপনিষদীয় জ্ঞানবাদ প্রথমতঃ পরিপূরক হিসাবেই উদ্ভুত হইয়াছিল, ক্রমে তাহা কর্ম্মবাদের সহিত বিদ্রোহ ও বিচ্ছেদের আকারে উপস্থিত হইয়াছে এবং বৌদ্ধ, জৈন ও চার্ব্বাক প্রভৃতি তথাকথিত নাস্তিক-দর্শনের (heterodox systems) ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিয়াছে।

ভারতীয় দর্শনের এই বিভিন্ন আদর্শ দুইটীর ভিতর যে বিরোধ তাহা সুপ্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিলেও পাশ্চাত্য দেশীয় রোমান্ কেথলিক্ ধর্ম্ম ও প্রোটেষ্টেন্ট্ ধর্ম্মের বিরোধের ন্যায় তেমন তীব্র আকার ধারণ করিয়া রক্তপাতের সৃষ্টি করে নাই। পরন্তু, যুগে যুগে এই উভয় আদর্শের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করিবার চেষ্টা হইয়া আসিয়াছে এবং গীতায় সেই মহান্ সামঞ্জস্য শিব ও সুন্দর হইয়া ফুটিয়াছে দেখিতে পাই।

"ফাগুনের ব্যথা"

(শ্রীহেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

পলাশের বনে জ্বালায়ে আগুন
ফাগুন এসেছে আজ।
তাই বুঝি আজ নিখিল ভুবনে
এ নব মোহন সাজ।
নীপ-নিকুঞ্জে উঠিছে ফুকারি'
কোকিল পাপিয়া পলকে শিহরি,
বাতায়ন পথে সজল কাজল
বিরহ-দগধ বধূ।
সাধের যৌবন কাটিবে কি তবে
স্মৃতিটি স্মরিয়া শুধু!

গুঞ্জন-ভরা মধুপ পুঞ্জে
ভরে গেছে দশদিশি,
মাতাল পবন বিলাইছে গান
আকাশে ভুবনে মিশি।
আমের মুকুলে ভরেছে দুকূল
সুরভি-নেশায় সজিনার ফুল,
আলিপনা এঁকে দিয়েছে অশোক
তব আবাহন লাগি।
সোহাগিনী ওই বেঁধেছে কবরী
কাহার দর মাগি!

অনল জ্বলিছে হৃদয়ে আমার
দহিছে দিবস যামী।
জগতে মরতে মিলন কাহিনী
বঞ্চিত শুধু আমি!
মলয় মদির পরশ লাগিয়া
নব কিসলয় উঠিছে জাগিয়া,
তোমার আভাষ দিয়াছে সকলি
আসিলে না তুমি প্রভু।
সারা জনমের এত আশা মম
পূরণ হবে কি কভু?

রেডিয়াম-রহস্য।

(শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এস্‌সি)

রঞ্জনরশ্মি আবিষ্কারের পর পদার্থমাত্র হইতেই স্বতঃ কোনও অজ্ঞাত রশ্মি বিকীর্ণ হয় কিনা এই তত্ত্ব জানিবার জন্য বৈজ্ঞানিক জগতে এক চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। যে সব পদার্থ অন্ধকারে ঝলমল করে, সেইসব প্রথমতঃ বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষার কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল। বিজ্ঞানের এই ধারায় পূর্ব্বতন অনুসন্ধিৎসুদের মধ্যে প্রফেসার 'হেনরী বেকেরেলের' নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি 'ইউরেনিয়াম' জাতীয় পদার্থ কাল কাগজে

পূর্ব্বাভাস

মুড়িয়া তাহার সম্মুখে একখানা রূপার পাত রাখিয়া তৎপর ফটোর প্লেটের উপর স্পষ্ট চিহ্ন পান। ইহা হইতে এই প্রমাণিত হয় যে, ঐ পদার্থ হইতে একটা অদৃশ্য রশ্মি বাহির হইয়া কাল কাগজ ও রূপার পাত ভেদ করিয়া আসিতেছে, এবং সাধারণ আলোকের মত ঐ আলোও ফটোর প্লেটের উপর দাগ ফেলিতে পারে। এই শ্রেণীর পদার্থ নিয়া গবেষণা করিতে যাইয়া ফরাসী মহিলা 'মেডেম কুরী' (Mdme Curie) ইউরেনিয়াম হইতে লক্ষ লক্ষ গুণ শক্তিশালী 'রেডিয়াম'-নামক মৌলিক পদার্থের আবিষ্কার করেন। এই কাজের জন্য অষ্ট্রিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কয়েক টন খনিজ পদার্থ প্রদান করেন। ইহা হইতে তিনি অশেষ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের পর কণিকামাত্র রেডিয়াম বাহির করিতে সমর্থ হন। জগতের ইতিহাসে ঐরূপ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় যেরূপ বিরল, এরূপ অত্যাশ্চর্য্য ফললাভও তেমনই বিরল। এই আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানের এক নূতন ও সুবিস্তৃত শাখার সৃষ্টি হইয়াছে। আজ পৃথিবীর নানা দেশ হইতে পণ্ডিতমণ্ডলী প্যারিসে এই বর্ষীয়সী মহিলার বিজ্ঞানাগারে গবেষণায় লিপ্ত আছেন।

এই রেডিয়াম জাতীয় পদার্থ হইতে তিন রকমের রশ্মি বিনির্গত হইতেছে। গ্রীক

রেডিয়ামের সাধারণ গুণ

বর্ণমালা অনুসারে তাহাদের 'আল্‌ফা,' 'বিটা' ও 'গামা' রশ্মি বলিয়া নামাকরণ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে 'গামা' রশ্মি রঞ্জনরশ্মির মত অনেক জিনিস ভেদ-করিয়া চলিয়া যাইতে পারে। মৌলিক পদার্থ হইতে এইরূপ রশ্মি বিকিরণের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব মৌলিক পদার্থ অন্যান্য মৌলিক পদার্থে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কতকগুলি পদার্থের রূপান্তর এত ধীরে ধীরে হয় যে, তাহা বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষায় ধরা পড়ে না। আর যেগুলির রূপান্তর খুব তাড়াতাড়ি ঘটে, সেগুলিই রেডিয়াম জাতীয় পদার্থের মধ্যে শক্তিশালী বলিয়া পরিগণিত।

রেডিয়াম জাতীয় পদার্থ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত স্থানে সূক্ষ্ম ভাবে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। তাই ইহা সংগ্রহ করা এত দুঃসাধ্য। রেডিয়ামের মূল্য স্বর্ণ অপেক্ষা একলক্ষ গুণেরও অধিক। এই অস্বাভাবিক মূল্যের কারণ আর কিছুই নহে; একদিকে ইহা যেমন নিতান্ত সূক্ষ্মভাবে বিস্তৃত, অন্যদিকে অন্যান্য পদার্থ হইতে ইহাকে পৃথক্ করাও অশেষ শ্রমসাধ্য।

প্রাপ্তিস্থান

রেডিয়াম ভূ-স্তরে, খনিজ পদার্থে, প্রস্রবণ, নদী ও সমুদ্রের জলে ও বায়ুমণ্ডলে সর্ব্বত্র সূক্ষ্ম কণিকারূপে বিদ্যমান আছে। রেডিয়াম হইতে সর্ব্বদাই উত্তাপ বাহির হইতেছে। সেজন্য ইহার তাপ পার্শ্ববর্ত্তী পদার্থ হইতে সর্ব্বদাই কয়েক ডিগ্রী বেশী থাকে। রেডিয়াম হইতে কি পরিমাণে উত্তাপ বাহির হইতেছে, তাহা পরীক্ষাদ্বারা নিরূপিত হইয়াছে। ভূ-স্তরে রেডিয়াম যে পরিমাণে আছে, সুদূর ভূগর্ভেও যদি সেই পরিমাণে থাকিত তাহা হইলে পৃথিবীর উত্তাপ দিন দিন বাড়িয়া চলিত। কিন্তু তাহা ঘটিতেছে না বলিয়াই সিদ্ধান্ত করা হয় যে, ভূস্তরের অপেক্ষাকৃত পাতলা আবরণ পর্য্যন্তই রেডিয়াম বর্ত্তমান আছে; ভূগর্ভে ইহা নাই বলিলেও চলে।

ভূগর্ভস্থ এই শক্তিশালী রেডিয়ামের সহিত ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির উদ্ভবের অনেক সম্বন্ধ আছে। পৃথিবী এককালে অগ্নিময় গোলকের মত ছিল। যুগে যুগে ইহার বহির্ভাগ শীতল হইয়া মনুষ্যবাসোপযোগী হইয়াছে; কিন্তু অভ্যন্তর ভাগ এখনও উষ্ণ রহিয়া গিয়াছে। বহিরাবরণে রেডিয়াম থাকায় সেখানে আবার উত্তাপ ও শক্তির আধার রহিয়াছে। সুতরাং পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত ভিতরকার স্তর, নীচ হইতে উত্থিত আভ্যন্তরীণ উত্তাপ এবং উপর হইতে রেডিয়ামনিঃসৃত উত্তাপ, এই উভয়-প্রকার উত্তাপের প্রভাবে গ্রন্থির সমতা হারাইয়া বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং ভূমিকম্প, আগ্নেয়োৎপাত প্রভৃতি প্রলয়কারী বিপ্লবের সৃষ্টি করে।

রেডিয়াম ও ভূকম্প ইত্যাদি

সমুদ্রগর্ভে স্তর, প্রবাল দ্বীপ ও দেশ মহাদেশ গঠনের উপর রেডিয়ামের যথেষ্ট প্রভাব রহিয়া গিয়াছে। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, পূর্ব্বে এক প্রকাণ্ড মহাদেশ ভারত মহাসাগর বক্ষে আফ্রিকার পূর্ব্বদক্ষিণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; আজ তাহা সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন। কিন্তু রেডিয়াম বিজ্ঞানের সাহায্যে দেখা গিয়াছে যে, আভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্ত্ত-প্রবাহে এরূপ একটা মহাদেশের নিমজ্জন সম্পূর্ণ অসম্ভব। কাজেই এরূপ কোন মহাদেশ ছিল না বলিয়াই মনে করিতে হইবে।

রেডিয়াম ও ভূমির গঠন

সৌর জগতের জ্যোতিষ্কমণ্ডলেও রেডিয়ামের অস্তিত্বের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। রেডিয়াম হইতে 'আল্‌ফা' রশ্মি বাহির হইয়া হিলিয়াম নামক বাষ্পে রূপান্তরিত হইতেছে। অনেক গ্রহ নক্ষত্র হইতে যে আলোক আসিতেছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া তাহার মধ্যে

চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। সৃষ্টির প্রাক্ যুগে পৃথিবী যদি সূর্য্য হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে তাহা হইলে সূর্য্যের মধ্যেও রেডিয়াম জাতীয় পদার্থের লক্ষণ পাওয়া উচিত। আলোক বিশ্লেষণে সূর্য্যের মধ্যে রেডিয়াম ও হিলিয়ামের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলেন যে সূর্য্য হইতে দ্রুতবেগে 'বিটা' রশ্মি বাহির হইয়া পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছায় এবং 'অরোরা' বা উদীচ্যালোকের অত্যাশ্চর্য্য বৈচিত্র্য ঘটাইয়া থাকে।

রেডিয়াম ও সৌর জগৎ

পূর্ব্বে ভূতত্ত্ব ও প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণ নানা উপায়ে পৃথিবীর বয়স নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। ভূস্তর ও জীর্ণ পর্ব্বতগাত্র, মৃত জন্তুর কঙ্কাল ও পালক ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া পৃথিবীর আনুমানিক বয়স নিরূপণ করা হইয়াছে। পৃথিবীর উত্তপ্ত তরল অবস্থা হইতে ক্রমশঃ শীতল হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিতে কতদিন লাগিতে পারে, তাহা নিরূপণ করিয়া লর্ড কেল্‌ভিন পৃথিবীর বয়স স্থির করেন; কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে যে উত্তাপের আধার 'রেডিয়াম' রহিয়া গিয়াছে তাহা তিনি এই প্রশ্নের মধ্যে বিবেচনা করেন নাই। সুতরাং এই বয়স নিরূপণ নির্ভুল ধরা যাইতে পারে না।

এখন রেডিয়াম হইতে কিরূপে পৃথিবীর বয়সনির্ণয়ের সুবিধা হইয়াছে দেখা যাক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে রেডিয়াম জাতীয় পদার্থ হইতে 'আল্‌ফা' রশ্মি বাহির হইয়া হিলিয়াম বাষ্পে পরিণত হইতেছে। এই হিলিয়াম নিতান্ত হাল্কা গ্যাস বলিয়া আজকাল উড়ো জাহাজে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। যে সকল পর্ব্বতস্তর হইতে এখন রেডিয়াম ও হিলিয়াম এক সঙ্গে পাওয়া যাইতেছে, সৃষ্টির প্রাক্কালে সেখানে রেডিয়াম ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। রেডিয়াম হইতে কি পরিমাণে হিলিয়াম বাহির হইতেছে, তাহাও বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষা দ্বারা স্থির করা হইয়াছে। এখন কোনও স্তরে রেডিয়াম এবং হিলিয়াম কি পরিমাণে আছে তাহা স্থির করিতে পারিলেই কত বৎসরে এতটা হিলিয়াম জমা হইতে পারে তাহা নির্ণয় করা যায়। ইহা হইতেই পৃথিবীর বয়সও নির্ণীত হইতে পারে। এই হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, রেডিয়াম খনি বা পৃথিবীর বয়স অনুমান দুই হাজার হইতে তিন হাজার লক্ষ বৎসরের মধ্যে।

রেডিয়াম ও পৃথিবীর বয়স নিরূপণ

সূর্য্য হইতে যে পরিমাণ উত্তাপ বাহির হইয়া আসিতেছে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, আর কয়েক হাজার লক্ষ বৎসর পর পৃথিবী পর্য্যন্ত আর মনুষ্য-বাসের উপযোগী উত্তাপ আসিবেনা; কিন্তু সূর্য্যের মধ্যে রেডিয়াম জাতীয় পদার্থ বিদ্যমান থাকায় আশা করা যায় যে মানুষের এত শীঘ্র নিরাশ হইবার কোনও কারণ নাই। সূর্য্যের উত্তাপ আরও অনেক কাল রক্ষা পাইবে।

এখন রেডিয়াম রশ্মি জীবদেহে কি কি পরিবর্ত্তন ঘটায় সে সম্বন্ধে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অধিক দিন এই রশ্মি শরীরের ভিতর দিয়া যাইলে প্রথমতঃ ঐ স্থানে জ্বালা হয় এবং বিশপঁচিশ দিন পর্য্যন্ত ঐ স্থান ফুলিয়া থাকে। রেডিয়াম হাতে ধরিলে অঙ্গুলী ফুলিয়া কিছু দিন পরে চামড়া খসিয়া যায়; এবং প্রায় দুইমাস কাল হাতে জ্বালা বোধ হয়। রেডিয়াম রশ্মি মাথার উপর বেশীদিন লাগিলে আস্তে আস্তে চুল পড়িয়া যায়; তবে অধিকাংশ স্থলেই চুল আবার উঠিয়া থাকে। শরীরের ভিতর দিয়া কিছুদিন 'বিটা' ও 'গামা' রশ্মি চালাইলে রক্তের সাদাকোষ (White cell) কমিয়া যায়। এই বিটা ও গামা রশ্মির প্রভাবে শরীরে যেরূপ নানা প্রকার দুষ্ট জীবাণুর সৃষ্টি হয়, সেরূপ কোন কোন উৎকট জীবাণুর ধ্বংসও হইয়া থাকে। কেন্‌সারের (Cancer) জীবাণু এই রশ্মির সাহায্যে ধ্বংস করা যায় বলিয়া আজকাল এই রোগ আরামের জন্য রেডিয়ামরশ্মি ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এই রশ্মি আরও কোন কোন ব্যারামে ব্যবহার করা যায় বলিয়া দেশে দেশে রেডিয়াম চিকিৎসালয় ও পরীক্ষাগার স্থাপিত হইয়াছে। অন্ধকার গৃহে বদ্ধ চক্ষুর সম্মুখে রেডিয়াম জাতীয় পদার্থ রাখিলে চোখের ভিতর অস্পষ্ট আলোর আভা পাওয়া যায়। অন্ধ লোকের চক্ষুর পরদা (Retina) যদি নষ্ট না হইয়া যায় তবে তাহারাও এই আলোর আভা পাইতে পারে। এই আলোর সাহায্যে অন্ধদিগের ক্ষীণদৃষ্টি লাভ অসম্ভব নহে।

জীবদেহে রেডিয়ামের ক্রিয়া

এখন রেডিয়ামের অসাধারণ শক্তি কি রূপে মানুষের কাজে ব্যবহার করা হইয়াছে তাহাই দেখা যাক্! কোনও যন্ত্রের সাহায্যে অবিশ্রান্ত গতি (Perpetual motion) লাভ করা অতি প্রাচীন কাল হইতেই বৈজ্ঞানিকের আশা ও উদ্দেশ্য ছিল। শক্তি চিরন্তন, ইহার সৃষ্টি ও ধ্বংস করা চলে না। রেডিয়ামের অসাধারণ শক্তির সাহায্যে এরূপ যন্ত্রগঠন সম্ভবপর হইয়াছে, যাহাদ্বারা অবিশ্রান্ত গতি লাভ করা যায়। এই যন্ত্রের নাম 'রেডিয়াম ক্লক্' (Radium clock)। একটা বায়ুশূন্য বোতলের মত পাত্রের ভিতর সরু কাচের নল আটকান আছে। ঐ নলের ভিতর সামান্য রেডিয়াম রাখা হইয়াছে; এবং উহার অগ্রভাগে দুইটী পাতলা প্লেটিনামের পাত আটকানো আছে। রেডিয়াম হইতে তিন প্রকারের রশ্মি বাহির হওয়ার ফলে ঐ পাত দুইটীতে তড়িতের সমাবেশ হইতেছে। সমধর্ম্মাবলম্বী তড়িৎ বিপরীতদিকে চলে বলিয়া, পাত দুইটী পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পার্শ্বে পাত্রের গায়ে ঠেকিয়া সেখানে তড়িৎ-শূন্য হওয়া মাত্রই পাত দুইটী আবার স্বস্থানে আসিয়া সম্মিলিত হইতেছে। রেডিয়াম হইতে রশ্মি বিকিরণ অবিরত চলিতেছে। কাজেই আবার তড়িতের সমাবেশ হওয়ায় পাত দুইটী বিচ্ছিন্ন ও মুদিত হইতেছে। এই ব্যাপার অবিশ্রাম চলিতেছে। এই সম্মিলন ও বিচ্ছেদের ভিতর যে সময় লাগে তাহা নলের ভিতরস্থিত রেডিয়ামের পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

রেডিয়াম ক্লক্

রেডিয়াম বেশী থাকিলে এই ব্যাপার খুব তাড়াতাড়ি চলিতে থাকিবে। সাধারণতঃ এই প্রকারের যেসব যন্ত্র তৈয়ার করা হইয়াছে তাহাতে এই ব্যাপারে পনর সেকেণ্ড সময় লাগে। এই সময় জানা থাকিলে এই যন্ত্র ঘড়িরূপে ব্যবহার করা যায়। সাধারণ ঘড়িতে যেরূপ স্প্রিংএ চাবি দিয়া শক্তি যোগাইতে হয়, ইহাতে এইরূপ কিছুই করিতে হয় না। রেডিয়ামের সঞ্চিত শক্তির সাহায্যেই ইহা চলিতে থাকে। এই ঘড়ি আপনা হইতেই সহস্র সহস্র বৎসর চলিবে ; অবশ্য রেডিয়ামের পরিমাণ ক্রমে কমিয়া আসিবে এবং তৎসঙ্গে উহার কাজও আস্তে আস্তে চলিবে। বিজ্ঞানাগারের পরীক্ষা হইতে আমরা জানি যে অর্দ্ধেক শক্তি হারাইতে রেডিয়ামের প্রায় সাড়ে সতরশত বৎসর লাগে। সুতরাং ঐ সময়ও এই ঘড়ি চলিতে থাকিবে ; তবে, এখন পাত দুইটী যদি পনর সেকেণ্ডে মুদিত ও বিচ্ছিন্ন হয়, তখন ইহাতে ত্রিশ সেকেণ্ড সময় লাগিবে। কিন্তু তখনও উহা ঘড়ির কাজ করিবে।

এখন রেডিয়াম হইতে মানুষ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি আশা করিতে পারে তাহাই আলোচনা করা হইবে। যে রেডিয়াম এককালে বৈজ্ঞানিকের নিকট অত্যাশ্চর্য্য পদার্থ ছিল, শক্তির রক্ষণশীলতা অমান্য করিয়া অবিরত আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপের মত আলোক ও উত্তাপ দিতে ছিল, সেই রেডিয়াম আর এখন রহস্যময় নয়। একদিকে ইহার রহস্য যেমন সম্পূর্ণরূপে ভেদ করা হইয়াছে, অন্যদিকে ইহার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য শতগুণে বাড়িয়া উঠিয়াছে। পদার্থের মধ্যে রেডিয়াম এরূপ অদ্ভুত কেন তাহার কারণ

রেডিয়াম ও ভবিষ্যতের আশা

এই নয় যে, ইহার মধ্যে অনন্যসাধারণ শক্তি নিহিত রহিয়াছে ; বস্তুতঃ অন্যান্য পদার্থের মধ্যেও ঠিক এই পরিমাণে শক্তি নিবদ্ধ আছে। তবে তাহাদের পরিবর্ত্তন লোকচক্ষুর অন্তরালে এত ধীরে ধীরে হইতেছে এবং রেডিয়ামের পরিবর্ত্তন ও তদানুসঙ্গিক শক্তির নিষ্ক্রমণ এরূপ দ্রুতভাবে চলিতেছে যে রেডিয়াম সেই জন্যই পদার্থ সমূহের মধ্যে এক বিস্ময়কর স্থান অধিকার করিয়া আছে। রেডিয়াম-বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া আমরা এই বুঝিতে পারি যে, পদার্থ মাত্রেই অনন্ত শক্তির আধার। রেডিয়ামের শক্তি যেমন আপনা আপনিই বাহির হইয়া মানুষের নানা কাজ সম্পাদন করিতেছে, অন্যান্য পদার্থের অন্তর্নিহিত শক্তিও যদি কৃত্রিম উপায়ে বাহির করিয়া আনা যায়, তাহা হইলে উহাও ঐরূপ মানুষের কাজে লাগান যায়।

এই শক্তি আহরণের পথে আজ আমরা মাত্র পদক্ষেপ করিয়াছি। অতি আদিম কালে মানুষ যেমন চারিদিকে উপাদান থাকা সত্ত্বেও অগ্নিসংযোগ করিতে জানিত না এবং দাবাগ্নি দেখিয়াই অগ্নিসংযোগের উপায় খুঁজিয়াছিল ; আজ আমরাও চারিদিকে অসীমশক্তির আধার অনন্ত পদার্থরাজি থাকা সত্ত্বেও রেডিয়াম হইতে স্বভাবনিসৃত শক্তির আভাস পাইয়াই শক্তি-আহরণে অগ্রসর হইয়াছি। প্রকৃতি আজও সুদৃঢ় দুর্গের ভিতর

সমস্ত শক্তি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যত দিন সেই দুর্গ মানুষের হস্তে না আসিবে ততদিন প্রকৃতির সহিত তাহার অবিরাম যুদ্ধ চলিবে। মানুষের শুধু এই শক্তি সংগ্রহের উপায় জানিলে চলিবে না; তাহার ব্যবহার ও সম্যক্ আয়ত্ত করিতে হইবে। নতুবা বিপ্লব ঘটিয়া মানুষের পতন হইতে পারে।

চতুর্দ্দিকে যে অনন্ত শক্তি সুপ্ত রহিয়াছে তাহা উদ্বুদ্ধ করাই মানুষের প্রথম কাজ। এই শক্তির সীমা মানুষের জ্ঞানের সীমা দ্বারাই নির্দ্দিষ্ট হইবে। এই সেইদিনও নাকি সেফিল্ডে ডাক্তার ওয়াল (Dr. Wall) চুম্বক শক্তির সাহায্যে পদার্থ হইতে কতকটা শক্তি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত জীবনযাত্রা যে কঠোরতর সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এইরূপ গবেষণাই তাহার একমাত্র সমাধান। যখন এই উপায় মানুষের আয়ত্ত হইবে তখন একটা মৌলিক পদার্থকে আর একটা মৌলিক পদার্থে পরিবর্ত্তন করিয়া অসাধারণ শক্তি আহরণ সম্ভবপর হইবে। স্বর্ণকে রৌপ্যে পরিবর্ত্তন করিতে যাইয়া যে শক্তি বাহির করা যাইবে তাহার মূল্যের তুলনায় স্বর্ণের মূল্য কিছুই হইবে না। শত শত মন কয়লার পরিবর্ত্তে মুষ্টিমেয় ধূলিকণা হইতে যে শক্তি আহরণ করা যাইবে তাহাই একটা প্রকাণ্ড এঞ্জিন্ চালাইবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। আমরা আর একটা ধ্বংসোন্মুখ পৃথিবীর মরণোন্মুখ জাতি নই। অভ্যন্তরস্থ শক্তির প্রভাবেই পৃথিবী আপনার যৌবন চিরকাল রক্ষা করিতে পারিবে। মানুষও শক্তি আহরণের উপায় আয়ত্ত করিয়া নিজের অবস্থা উন্নত ও সমৃদ্ধ করিতে পারিবে; প্রকৃতির কোলে দুগ্ধপোষ্য শিশুর মত পড়িয়া না থাকিয়া তাহার উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব করিতে পারিবে। সেই স্বর্ণযুগে বৈজ্ঞানিক তাহার যাদুবলে একটা মরুভূমিকে হাস্যময় উদ্যানে পরিণত করিতে পারিবে, তুষারমণ্ডিত মেরুদেশ শস্যশ্যামল হইবে, সমস্ত পৃথিবী একটা নন্দনে পরিণত হইবে। ইহাই বৈজ্ঞানিকের আশা, ইহাতেই তাহার চরম উৎকর্ষ।

উপসংহার

কবি

(শ্রীসুশীলচন্দ্র সেন গুপ্ত)

সে ছিল কবি--সে ছিল এই পৃথিবীর ছন্নছাড়া মানব শিশু! কবে একদিন যেন এই চিরকরুণ কবি উধাও হ'য়ে এসে বস্‌ল জনাকীর্ণ এই নগরীর প্রাচীর-প্রান্তে নির্জ্জন কুটীরে। উর্ব্বশীরই মত আদি অন্ত তা'র সেখানকার কেউ জান্‌ত না।

কবির সাথী ছিল একখানি বীণা, ব্যথিত দৃষ্টি আর অন্তর ভরা বেদনা! হৃদয়ের কোন্ বেদনা যে তা'র ব্যথিত উদাস দৃষ্টিতে ফোটে উঠ্‌ত, তা কেউ জান্‌ত না! সে শুধু চেয়ে থাক্‌ত শূন্য নয়নে আকাশময় বিপুলতার দিকে, আননে তা'র কান্না ঝরে পড়ত!

সমস্ত দিনের শেষে সন্ধ্যা যখন ধূসর আবরণ ধরণীর বুকে জড়িয়ে দিত, কবি তখন কি জানি কেন তা'র বীণাখানি হাতে ক'রে ক্ষীণা স্রোতস্বিনীর তটে বস্‌ত! চারদিকে জল, স্থল, সব যখন নিস্তব্ধ গম্ভীর হয়ে যেত, কবি অজ্ঞাতে কেমন ক'রে তা'র বীণায় ঝঙ্কার দিত! একলা বসে কবি আপন বীণাটি সাধ্‌ত; শ্রোতা তা'র কেউ ছিল না, শুধু আপন মনেই সুরে মজ্‌ত! আর গাছ পাতা, নদী জল সব মৌন হ'য়ে যেত! বিশ্বপ্রকৃতি তা'কে আপনার বলে কোলে তুলে নিত! তা'র করুণ বীণাঝঙ্কার যখন, আকাশে বাতাসে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে পড়্‌ত, তখন কবি আপনিই তা'র সৃজিত স্বপ্নলোকে ডোবে থাক্‌ত! সে কি ঝঙ্কার! কি করুণ সে বীণা! ‑যেন কত কালের সঞ্চিত অযুত-বেদনা সমুদ্র-মন্থন করে সে সুরের উৎপত্তি! সে যে কি বেদনার গভীর উচ্ছ্বাস! কবি তা'র দৃষ্টিখানি মেলে ধর্‌ত, অসীম গগণের কোণে, আর সুরের ব্যথায় ক্ষীণা তটিনী পদতলে তা'র উচ্ছ্বসিত হ'য়ে হ'য়ে ব'য়ে যেত!

কি বেদনা যে তা'র অন্তরে শুধু জ'মে জ'মে স্তূপাকার হ'য়েছে, কিসে তা'র হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে দিচ্ছে, সে ত কেউ জান্‌ত না—লোকে মনে কর্‌ত এ একটা পাগল, একটা ছন্নছাড়া মানবসন্তান! তার কুটীরের পাশ দিয়ে যারা কোন দিন আস্‌ত যেত, তা'রা এই গোপনচারীর বীণাঝঙ্কার শু'নে ক্ষণেকের জন্য থম্‌কে দাঁড়াত,—লোকটিকে দেখে করুণার দৃষ্টি হেনে চলে যেত!

চার্‌দিকের এই বিশ্বপ্রকৃতিকে সে কি চোখে দেখ্‌ত, তা' সেই জানে! কিন্তু নগরীর এই অসম্ভব কল কোলাহল, এই লোকারণ্য, এ সবকে বরাবরই সে ধরার জঞ্জাল ব'লেই মনে করে আস্‌ছিল। বিশ্বের কৃত্রিমতাই ছিল তা'র দু' চোখের বিষ! চার্‌দিকের এই কোলাহলময়ী নগরীতে কৃত্রিম অভাব অভিযোগের সৃষ্টি ক'রে মানবের সদানন্দ, সহজ জীবনগতি কিরূপে

ভিন্নমুখী হয়, তা' সে জানত বলেই না এই জগৎকে ঘৃণার চোখে দেখ্‌ত ; আর দেখ্‌ত বলেই না লোকে তা'কে বল্‌ত পাগল !

কবির জীবনযাত্রা ছিল বড় বিচিত্র। কান্না হাসিতে, আলো আঁধারে, মেঘ ও রৌদ্রে জীবন তা'র কাট্‌ছিল বিচিত্র এক ছন্দে ! তা'র হৃদয়ের বিরাট আনন্দোচ্ছ্বাস কখন যে বেড়িয়ে পড়্‌ত, আর ক্ষণেক পরই যে কেন অমনি থেমে যেত—সে বিরাট জীবনগতির 'তুরীয়ানন্দে ছুটে' চলা, কেন যে মুহূর্ত্তেই মৃত্যুপথের পথিকের মত নিশ্চল হ'য়ে যেত, তা' কে জানে ?

বর্ষার বজ্রভেরী যখন দিকে দিকে বেজে উঠ্‌ত, এই তিক্ত পিপাসিত ধরার বুকে বাদল ঝরে পড়্‌ত ধরণীর ক্লেদ কালিমা ধু'য়ে মুছে দিয়ে, তখন কি কবি তাহার নবীন ছন্দে তার বন্দনাগীতি গাইত না ? আকাশের কালো মেঘে যখন বিদ্যুৎ ঝল্‌ত, নববধূর চকিত দৃষ্টির কালো ঝলকের মত, বর্ষার বাদল রাতে ঝিল্লীর নিবিড় গান, নিশীথিনীর বুকে করুণ হয়ে বেজে উঠ্‌ত, আর কি এক আলসে আবেশে ধরণী নু'য়ে পড়্‌ত, বিশ্ব ছেয়ে মাদল বাজার সাথে সাথে যখন আর্দ্র ধরার বাষ্প গন্ধ হৃদয় মনকে আকুল করে তুল্‌ত, কবির তখন কি করে কাট্‌ত ? কবি কি তখন বীণাটি নিয়ে তা'রি সাথে সুর দিতে চাইত না ? ওগো, সে যে তখন আপনহারা হ'য়ে যেত ! সে যে আপনাকে ভুলত, বিশ্বধরাকে ভুল্‌ত, আর ভুল্‌ত আপন হৃদয় ব্যথাকে ! অজ্ঞাতে যখন তার বীণার ঝঙ্কার অভিনব সৃষ্টি সুরু করে দিত, সে সুর যখন আর্দ্র ধরণীকে আচ্ছন্ন করে ফেল্‌ত, সুরগ্রাম ক্রমে ক্রমে যখন নিবিড় নিশীথিনীকে মুখর ও ছন্দময় করে তুল্‌ত,—হঠাৎ কবি তখন গাঢ় বেদনায় থে'মে যেত ! তখন কবি তা'র কল্পনার বরুণ লোক হ'তে কেন যে এই মাটির বাস্তবতায় এসে পড়্‌ত, তা কে জানে ? ভাদ্রের ভরানদী ছল্ ছল্ ক'রে যখন অনন্তের দিকে ছুটত আকুলি ব্যাকুলি কত কথা ক'য়ে ক'য়ে, এই অনন্ত চলার দিকে কবি যখন শিলাতলে বসে বসে চেয়ে থাক্‌ত— তখন তারও যে এই চলার গান গাইতে ইচ্ছা কর্‌ত ! তা'র সাধের বীণা যে ঝঙ্কার দিতে ব্যগ্র, ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌ত ! শরতের আকাশে সাদা মেঘ স্তরে স্তরে সাজান থাক্‌ত, গগন-সায়রে যখন মেঘের ঢেউ খেলে যেত এক প্রান্ত থেকে আর প্রান্ত পর্য্যন্ত, কবি আত্মবিস্মৃত হয়ে সেই অসীম সৌন্দর্য্য-শিল্পের দিকে চেয়ে থাক্‌ত ! তা'র কুটীরের পাশে ক্ষীণা তটিনী কল্ কলে ব'য়ে যেত কোন্ সুদূরে, আর মিশ্‌ত যেয়ে অসীম গগনের কোলে, স্বপ্ন স্মৃতির আবেশময় শ্যামল পল্লীর আবেষ্টনে ! সুদূর পারে সোণার ধানের ক্ষেতের ভিতর গিয়ে, সে জলরাশি মিশে কি এক অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি কর্‌ত ! শরতের অরুণ আলো তা'র কুটীর প্রান্তে এসে ঠেক্‌ত,—তা'র অন্তর খানিও অব্যক্ত আলোতে রাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌ত ! হাসি তা'র চোখে মুখে ফোটে বেরুত ! সে তা'র বীণাখানিতে হাত দিতে গিয়ে অম্‌নি চকিতে থেমে যেত ! কিসের উচ্ছ্বাস যেন তা'র হৃদয়-সমুদ্র মন্থন করে উঠ্‌ত ! সমস্ত মুখ তার ব্যথায় ভরে যেত, সমস্ত দেহে তা'র গ্লানিমা ছেয়ে ফেলত।

মধুমাস ধরার বুকে নূতন করে লালিমা লেপে দিত, গানে গন্ধে বসন্তকে মদির করে তুল্‌ত— তখন ? যখন মলয় পবন নব জীবনের স্রোত বইয়ে, এককে অপরের বার্ত্তা এনে দিত, বিশ্বের মৃত ম্লানিমা ঝেড়ে নিয়ে যে'ত, বিশ্ব মন্দিরের মোহ ও জড়তা ঘুচিয়ে দিয়ে যেত, তখনও কি কবি মৌন, মূক হ'য়ে থাক্‌ত ? যখন ধরার আনন্দ কলরবে, বিহঙ্গশিশুরা আনন্দ কাকলী জাগাত 'পথ-তরুশাখে' ফুল ফুটত, সৌরভে ভুবন আলো কর্‌ত, চূত-মুকুলের গন্ধ দিশি দিশি ছড়িয়ে পড়্‌ত, তখনও কি কবির নিরানন্দ দূরে যেত না ! কবি কি তবে মানুষ নয় ? বসন্তের মদিরতা মানবকে সুখস্বপ্ন দেখিয়ে দিত, মিলন লাগি চরাচর পাগল হ'য়ে উঠ্‌ত, তখন কবি ? হ্যাঁ, তখনও কবির ধ্যানমৌনতা, আত্মবিস্মৃতি ! কবি পাগলপারা হয়ে যেত ! কবির বীণায় তখন বড় করুণ রাগিণী বাজ্‌ত ! বীণা কেঁদে উঠ্‌ত, গাইত "ওগো, আমি কি চাই, তা কি আর পাব না ? আমি আর কত কাল এমনি করে মর্‌বো ! চিরকাল আমার পূজা, আমার নৈবেদ্য শুধু বিফলেই যাবে ? ওগো আমি যে আর পারি না, জীবন আমার এমনি ফুরিয়ে এল ; ওগো, আমায় বলে দাও গো, বলে দাও, আমি কি এমনি করেই মর্‌বো ? চিরকাল কি আমায় এমনি জীবন সংগ্রামে ক্ষ'য়ে যেতে হবে ! তবে নাও গো নাও, আমায় শীঘ্র নিয়ে যাও, আমি যে আর পারি না ! আমি যে ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গেছি, ওগো আমায় তুলে লও, ওগো বল আমাতে প্রয়োজন কি ?" কবির জীবন কি তবে একটা বিরাট ব্যর্থতা ? কবি কি চায় ?—

* * * * * * *

রাজকন্যা ছিলেন মহা বিদুষী ; রাজকন্যা আঁক্‌তেন ছবি। রাজকন্যার তুলির লিখন কি ক'রে এত বড় সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করত ! তরুণী রাজকন্যা—তা'র ছবি দেখে প্রবীণ চিত্রকরেরা অবাক্ হ'য়ে যেত ! কি ক'রে রঙের উপর রঙ ফলিয়ে মানবের সুখ দুঃখ, আশা নিরাশাকে জীবন্ত ফুটিয়ে তুল্‌তেন, তা'র এতটুকু কোমল অন্তরে কল্পনার মহিমলোক সৃজন কর্‌তেন, তাই ভেবে রাজসভার লোক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হোত ! কি করে মানবের বুকের মৌন বাণী, অকথিত সঙ্গীত রঙের ছটায় ফুটে উঠ্‌ত তাই ভেবে রাজপুরী সারা হ'য়ে যে'ত ! মহীয়সী রাজকন্যা—চিত্রকলাই তা'র জীবনের সাধনা !

একদিন কেমন করে এই গোপনচারী কবির কথা রাজকন্যার কাণে এসে পৌঁছল ! নারী তা'র অন্তর ভরা মমতা ও কৌতূহল নিয়ে ডেকে পাঠালেন কবিকে ! কবি কিন্তু এলে না। সহরের কৃত্রিমতাকে সে বড়ই ভয় কর্‌ত ! কেন যে তার কিছুতেই মন উঠে না, কেন যে তা ব্যর্থতায় পূর্ণ।

রাজকন্যা আস্‌লেন নিজে, সখীকে সাথে নিয়ে ! তখন ম্লান সন্ধ্যায় কবি ঘরের কোণে ব'সে বীণা সাধ্‌ছিল ! বীণায় বাজ্‌ছিল একটি বড় করুণ সুর। কুটীর-প্রান্তে তটিনীর জল নিশ্চল, প্রাণহীন ; একটি কল্লোলও নেই ; তরুশাখে সন্ধ্যার ধূসরতা অল্পে-অল্পে আপন কালো আবরণ

জড়িয়ে দিতেছিল, চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ ; কবির সুরজাল জল, স্থল, আকাশ, বাতাস সবকেই ছেয়ে ফেলেছিল, করুণ সুরে সবকেই ম্লান ও নিরানন্দ করে তুলেছিল। বিশ্বপ্রকৃতির এমনি নীরবতার কোলে কতকাল পরে যেন কবির আবেগ-রুদ্ধ অন্তরের দ্বার ভেঙ্গে আজ ভোগবতীর শত ধারায় হৃদয় উৎসারিত হ'য়ে পড়ছে তা'র বীণার ঝঙ্কারে, সে স্রোত আজ যেদিকে যাবে সে দিককেই সিক্ত করে তবে ছাড়্বে। তাই কবি বীণায় ঝঙ্কার দিতেছিল, তার চোখে অবিরল অশ্রুধার! রাজকন্যা কুটীর দ্বারে দাঁড়িয়ে অবাক্, চোখে তা'র জল, হৃদয়ে তা'র কান্না ; বাইরের প্রকৃতি কেঁদে সারা, এমন করুণ বুঝি আর কিছুই হ'তে পারে না! এমন করে কাঁদতে বুঝি আর কেউ পারে না! যেন সেই-যুগের কবি বীণা বাজিয়ে দেবতা, ঋষি জল, স্থল, আকাশ বাতাস সবাইকে কাঁদিয়েছিল। রাজকন্যা বুঝ্লেন এ কবির হৃদয়-গলান কান্না, এ কবির তপস্যা! রাজকন্যা কবির তপস্যা ভাঙ্গ্লেন না! শুধু দাঁড়িয়ে রইলেন চোখে জল নিয়ে! ওগো আনন্দময়ী রাজকন্যা, তুমি চোখের জলে এখানে এমন ক'রে দাঁড়িয়ে কেন? কে তা'র উত্তর দেবে? রাজকন্যা বুঝি পূর্ব্বের সে রাজকন্যা আর নেই!

অনেকক্ষণে কেঁদে কেঁদে তবে বীণা থামল্! সুরের রেশ তখনও থামেনি। সে যে পাষাণ দ্রবীভূত ক'রে অসীম গগন প্রান্তরকে ছেয়ে ফেলেছে! নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় সে করুণ সুরের মূর্চ্ছনা যে গগন তলের নীল খিলানে গিয়ে ঠেকেছে, আর তারি প্রতিধ্বনিতে আর এক সঙ্গীত ব'য়ে আন্ছে! বিশ্ব প্রকৃতি আড়ষ্ট।

কবির আনন সিক্ত—নয়নের উদাস দৃষ্টি বাইরের অসীম নীরবতার পানে ; রাজকন্যার চোখে জল, মুখে হাসি! এমনি কেটে গেল অনেকক্ষণ!

রাজকন্যা চোখের জল মুছ্লেন, কবির নয়নের বারি শু'কিয়ে গেল ; রাজকন্যা কুটীরে ঢুকে ডাক্লেন "কবি?"—কবি তখন স্বপ্নলোকে, চমক্ খে'য়ে যেন জাগ্‌ল।

"কবি কি চাও তুমি? তোমার ব্যথা কি?"

কবি উদাস দৃষ্টি মেলে তা'র পানে চাইল! একি, এ যে আর এক স্বপ্নের জগৎ! সে কোথায়? কি সে দেখ্‌লো খানিকক্ষণ রাজকন্যার সজল কাজল চোখে—সে অবাক্। ওগো করুণাময়ী, তোমায় সে কি বল্‌বে? বল্‌বার তা'র কি আছে? তুমি এসেছ তা'র ব্যথা ধু'য়ে মু'ছে দিতে? কি জান তা'র তুমি? তোমার এ যে ব্যর্থ প্রয়াস, শক্তি আর তোমার কতটুকু! তুমি ত এই বাস্তবতারই মানুষ? সে যে বাস্তবতাকেই ভালবাসে না! তুমি করবে কি? সে চায় মুক্তি, ওগো এই বাস্তবতা হতেই মুক্তি! কত দিনের সঞ্চিত ব্যথা তার অন্তরে! কতদিন তা'র অন্তরের হাসি-গান, তা'র বেদনার জমাট বাধাকে তরল ক'রে দিতে চাইত ; কত দিন সে তার ব্যর্থতায় শেষে আপ্‌নি কেঁদে মর্‌ত, তবু প্রাণপণে সে বেদনা আপনারই অন্তরে চেপে রাখ্‌ত। ওগো সে চায় মুক্তি, এই বিরাট কদর্য্যতা হ'তে মুক্তি

সে যে আর পারে না—ওগো সে যে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে উঠেছে, সে যে আহত; সে যে আর চায় না এ জীবনের ভার বইতে! কেন চা'য় না জান? ওগো দেবী, তা'র প্রাণ চায় এক,—পৃথিবী ব'লে আর; সে কি করবে? তার প্রাণ চায় অক্ষয় সৌন্দর্য্য-লোকের সৃষ্টি ক'রে আনন্দের, অমৃতের নববার্ত্তা ধরাতে প্রচার করতে—তা'র প্রাণ চায় বরষার বজ্রভেরী যখন বেজে উঠে তখন কাজরী গাথায় তা'র সারা দিতে! শ্রাবণ রজনী যখন বাদল ধারায় স্নাত, অম্বর যখন 'মেঘ মেদুর'—তখন বাদলকে আরো করুণ ক'রে তুলতে, আপনা ভুলে এক লোকের সৃজন করতে যা পৃথিবীর অনেক উঁচুতে! সে যে চায় কল্পনালোকের দেবতাকে নিয়ে থাকতে,—সে চায়, শরতের আকাশের গান গাইতে, আর তা'র আলোর কণাকে নিয়ে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করতে! সে চায় ভাদ্রের ভরা নদীর মত ছল্ ছল্ কল্ কল্ তার বীণার সুরের তালে তালে জীবন গতি নিয়ে বিচিত্র ছন্দ-গানে নূতন জগৎ, পশু-পক্ষী-লোকের সৃজন করতে, সে চায় চেয়ে থাকতে দূরে, বহুদূরে যেখানে আকাশকে ধরণী কোল পেতে দিয়েছে, যেখানে শ্যামলিমায় ও নীলমায় অনন্ত মিলনে মিলিত হচ্ছে। সে চায় ঐ "সীমার মাঝে অসীমের গান গাইতে," সে চায় এই বিশ্ব জগৎকে নূতন রঙে রাঙ্গিয়ে তুলতে। সে চায় আলো গানের কোলাহলে আপন বীণায় ঝঙ্কার দিতে বিশ্বজগতে যাতে সোরগোল প'ড়ে যায়, আর সে সেই সুরসাগরে ডোবে থাকে! তার প্রাণ চা'য় অনাবিল আনন্দ-সৃষ্টি, মানবের মহামিলনের মঙ্গল-গীতি! সে চা'য় হ'তে শুধু সুন্দরের পূজারী, সে চায় প্রাণে প্রাণের স্পন্দন! সে চা'য় গাইতে মিলনের গীতি, ভালবাসার প্রীতি, সে চায় মানবের হৃদয়ের আনন্দ উৎসকে মুক্ত করে দিতে! সে ডাকে বিশ্ববাসীকে—তোমরা এস; অভাব, অভিযোগ কলহ, দ্বন্দ্ব, শ্রান্তি, ক্লান্তি, সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এস ওগো এস, নিয়ে যাও প্রাণের পাত্র ভরে অমৃত! সে চায় বলতে বিশ্ববাসীকে, ওগো আমি যে তোমাদেরই, একান্তই তোমাদের। বিশ্ববাসী তা'কে যে প্রাণ দিয়ে চায় না! সে কি ক'রবে! সে চায় নব নব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে পূজার নৈবেদ্য সাজাতে, চিরসুন্দরের পূজা করতে। হায়! পূজার প্রসাদ, নৈবেদ্য যে তা'র অভুক্তই রয়ে যায়, সে কি কম বেদনার কথা !!!

বিশ্বজগৎ বলে "ওরে হতভাগা, এ জগৎ মিথ্যা, তোর কবিতা মিথ্যা, তোর সৌন্দর্য্য-লোক মিথ্যা, তোর কল্পনা-লোক আরও মিথ্যা! ছেড়ে দে ওরে পাগল, ছেড়ে দে। জগৎ তোর কল্পনায় চলবে না! ওরে পাগল জগৎ চলে সত্যে, ধরা-বাঁধা নিয়মের জোরে, তর্কশাস্ত্রের জোরে। স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও মানবের বস্তুতন্ত্রতাতেই জগৎ চলবে! কেউ বলে, জগতের সনাতন পথে না চ'লে, তুই কেন মরতে চাস্? তোর কবিতা যে অসত্য, তোর কল্পনার নায়ক, সুন্দর মিথ্যা, তোর জগৎ ভুঁয়ো!" ওগো, ওকে ব'লে দাও, সে ক'রবে কি? সে সারাজীবন ধরে সাধনায় যে দেবতাকে হৃদয় মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ক'রল, জগৎ তাঁকেই ব'লে মিথ্যা; তা'র সৃজিত লোক

স্বপ্ন মাত্র! ওগো, সে যে কত বড় বেদনা; তা'র হৃদয় যে ফেটে প'ড়ে! সে কি কর্‌বে! বিশ্ব যে তাকে দূরে ফেলে দিতে চায়---তা'র সাধনার সিদ্ধিকে ব'লে মায়া! জগতের চার্‌দিকে শুধু তা'র ধিক্কার আর গঞ্জনা; তা'র প্রাণময় সত্যকে হেঁয়ালি ব'লে বিশ্ব উড়াতে চায়! ওগো সে ক'র্‌বে কি! জীবনের এই ব্যর্থতায়ই, এই যুদ্ধেই সে ক্ষত বিক্ষত! সে যে আর পেরে উঠে না! এতদিন এই প্রশ্নই সে সাধ্‌তেছিল তা'র আপন মনে নির্জ্জনে! এখনও সে বোঝে নি! সে শুধু রক্তাক্ত কলেবরে মর্ম্মন্তুদ যাতনায় ক্ষয়ে যাচ্ছে! এই যুদ্ধের কৃচ্ছতা, এই সমরের তিক্ততা তা'কে পাগল ক'রেছে, করুণ ক'রেছে; তা'র কবি-প্রাণকে দাবিয়ে মেরেছে। সে যে আর চায় না বাঁচ্‌তে! ওগো তাই সে এই পৃথিবীকে ঘৃণা করে, তাই সে চায় মুক্তি, সে চা'য় বিদায় এই মাটির বাস্তবতা থেকে!

দূরে গ্রামের কুটীরে দীপ জ্বলে উঠ্‌ল! বাইরের আকাশে অষ্টমীর চাঁদ হেসে উঠ্‌ল! আকাশ তারায় খচিত হ'য়ে উঠ্‌ল! চারিদিকে মলয় বায় বইল, রাজকন্যার মুখে হাসি ফোটে উঠ্‌ল! কবির মনের নীরব ভাষা, সে তা'র অন্তঃস্থল হ'তে কুড়িয়ে নিল!

সাম্‌নে এগিয়ে স্থির, আনন্দ-দৃষ্টি কবির মুখে ফেলে রাজকন্যা ব'লে উঠ্‌ল, "কবি জাগো, উঠ, তোমার প্রাণের আনন্দময় শিশুকে জাগাও! কবি, ভয় নেই, সে জেগে হৃদয় তোমার আলোক্রিত করে তুলবে। কবি, উঠ, তোমার বীণায় তান দাও! নূতন সৌন্দর্য্য-লোক সৃজন করো; বর্ষার বাদল, শরতের অরুণ আলো, ভাদ্রের ভরা নদী, সবকেই উচ্ছ্বসিত ক'রে তো'ল! বিশ্ব জুড়ে তোমার ছন্দের দোলা দাও, বিশ্ব চম্‌কে উঠ্‌বে! নাচবে, ওগো নাচবে। গম্ভীর মুখে হাসি ফুটবে, ওগো ফুটবে।

কবি! তোমার তরুণ চিত্তকে আজ নাচিয়ে তোল! নূতন সুর সাধ! নূতন ক'রে তোমার কল্পনার দেবতা, চিরসুন্দরের আবাহন গাও, বর্ষ ঋতু, বিশ্ব চরাচর সকলেই তোমার সে পূজায় যোগ দেবে! কবি, সংসারকে ভয়, দূর ক'রে দাও! তুমি বিশ্ব প্রকৃতিকে সাজিয়ে দাও, ছন্দময় ক'রে তোল! জগৎ যে প্রাণহীন হ'য়ে গেছে! শুধু তোমারি বীণায় আজ নবজীবনের অমৃত ঢেলে দাও, বিশ্ববাসী বাঁচুক্! তেমনি তুমি গাও কবি, তেমনি সুরে গাও, যে সুরে এই বসুন্ধরার সৃষ্টি হ'য়েছিল! তুমি ঝঙ্কার দাও তোমার বীণায়, আর তাঁরই গান গাও যিনি তোমার কল্পনার দেবতা! সাধক চায় আপন সিদ্ধি—কবি তুমি যে তারও উপরে! তুমি সেই সত্য, শিব, সুন্দরকে অনুভূতির রেশে হৃদয়ে জাগাও, আর তোমার বীণায় তাঁরই কথা, তাঁরই নব বার্ত্তা, তাঁরই কত গানে, কত ছন্দে, কত বর্ণে, জগতে প্রচার ক'রে দাও! নিজের সুখ সৌন্দর্য্য তুমি জগতের হিতার্থে ঢেলে দাও!

সেথায় নবজীবন দিবে যে তোমারই অমৃত, তুমি কবি, তুমি দেবতা! ওগো কবি! তুমি জাগো, তুমি বাঁচো কবি, তুমিই যে দেবতার অমৃত মানবকে বণ্টন ক'রে দেবে?"

কবি জেগে উঠ্‌ল! হাসি ও অন্তরের আলো তা'কে ক্ষণেকেই কিশোর করে তুল্‌ল! এত দিনের অন্তর ভরা তার জমাট বেদনা-সমুদ্র বাষ্প হ'য়ে উবে গেল! সোণার কাঠির স্পর্শে যেমন মৃতদেহে প্রাণ জাগে—তেমনি আজ রাজকন্যার স্পর্শে কবি জা'গল—তার জীবন ব্যাপী হতাশা, ম্লানিমা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে—

বর্ষা-প্রকৃতির ম্লান চন্দ্রিকা-করুণ বাইরের উদার আকাশের তলে দাঁড়িয়ে কবি বীণায় ঝঙ্কার দিল,—বহুদিন প'রে; আবার আকাশ বাতাস কেঁপে উঠ্‌ল, নদী, গিরি, কানন, নেচে উঠ্‌ল—নদী তলে চন্দ্র কিরণ হেসে উঠ্‌ল—সে সুর যেন বলছিল "কবে আমি বাহির হলেম্ তোমারি নাম নিয়ে"———

দূরে রাজমন্দিরে আরতির শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি এই জাগরণকে মঙ্গলময় ক'রে তুল্‌ল।

নাট্যে স্বপ্ন

(শ্রীপ্রাণ কিশোর গোস্বামী)

সকলেই স্বপ্ন দেখে। সুখী দুঃখী, রাজা প্রজা, স্বপ্ন দেখে না, এমন কেহই নাই। গরীব ও রাজার স্বপ্ন দেখে, রাজাও গরীবের স্বপ্ন দেখে! রাজার স্বপ্ন বৃত্তান্ত ইতিহাসের পাতার মধ্য দিয়া চিরন্তন হইয়া থাকে, কিন্তু গরীবের তাহা হইবার জো নাই। গরীবের স্বপ্ন বড় জোর কয়েকদিন বা মাস মনে থাকিয়া আপনি বিস্মৃতির গর্ভে চিরকালের জন্য বিলীন হইয়া যায়।

সাধারণ ব্যক্তির নিকট যাহা বাস্তব, জ্ঞানীর নিকট হয়ত তাহাই স্বপ্ন—মায়া! জ্ঞানীর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, সত্যের উজ্জ্বল আলো, সাধারণের চক্ষে নিষ্প্রভ—আবৃত, কুহক বা ছায়া। সত্যকে ছাড়িয়া মায়া বা বাস্তবকে বাদ দিয়া স্বপ্ন থাকে না, থাকিতেও পারেনা! কিন্তু বাস্তব এবং স্বপ্নের ভিতর যতটা ব্যবধান সাধারণ মানুষ কল্পনা করিয়া থাকে, তাহা সত্যসত্যই আছে কিনা সন্দেহ! কল্পনারই পরিস্ফুট পরিণাম বাস্তব—সত্য! এই অপরিস্ফুটের সহিত বাস্তবের যে একটা সম্বন্ধ আছে, তাহা বুঝাইতে, বিজ্ঞান ও সাহিত্যে, ছন্দে ও সুরে, কতই না চেষ্টা! এই বিরাট প্রকাশ চেষ্টা নিয়াই মানবের ইতিহাস!

নাটক বাস্তবের ছবি। সত্যের অস্ফুট স্ফুরণ। মায়ার মধ্য দিয়া সত্যকে চক্ষের সাম্‌নে মনের মতন দেখিতে নাটকের সৃষ্টি। কল্পনার সমষ্টি লইয়া স্বপ্ন। কতকগুলি, ভাব ব্যূহের অভিনয় নাটক। ভাল অভিনয় সুখের স্বপ্নের মতন জীবনে একটা রেশ রাখিয়া যায়। যাদের

লইয়া অভিনয় তারাও আবার জাগ্রতের তীব্র আলো ও স্বপ্নের কুহেলি ছায়ায় আমাদের সামনে একটা অভিনব রহস্যের সৃষ্টি করিয়া দেয়।

শকুন্তলা কণ্বমুনির পালিতা কন্যা। রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়ায় আসিয়া অতিথির ছলায় আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। ঋষিকন্যার অপূর্ব্বশ্রী দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। দুজনের মিলনও হইয়া গেল। শকুন্তলার আশ্রম-বিরুদ্ধ ধর্ম্ম প্রকাশ পাইল। রাজা এখন দেশে ফিরিয়াছেন। দৈবদুর্বিপাকে রাজার ভ্রম উপস্থিত। রাজা প্রিয়াকে নিতে লোক পাঠান না। শকুন্তলারও আর আশ্রমে থাকা চলে না। অগত্যা তাহাকে পাঠান হইল রাজবাড়ীতে। দেবতা বিরোধী। রাজা তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন। তিনি এই প্রত্যাখ্যানের সময় জাগ্রত ছিলেন কিনা তাহা কবি কালিদাসই জানেন। পরেই আংটি পাইয়া ঠিক্‌ঠিক্ জাগ্রতের মতন পরিচয় দিতেছেন। এবারে তাঁহার যথার্থ জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে। ভাবিতেছেন, এসব হইল কি ? আমি কি ঘুমাইয়া ছিলাম। শকুন্তলা মিলন ও বিচ্ছেদ কি স্বপ্ন ? না, এ কোন যাদুকরের যাদু ? ক্ষীণ মস্তিষ্কের স্নায়বিক দুর্ব্বলতার বিকার নয়ত ? কি এ ?

শকুন্তলা নাটকের প্রথম হইতে এই পর্য্যন্ত অস্ফুট হইলেও দুষ্মন্তের মনে বড় তীব্রভাবে প্রতিভাত হইতেছে। বাস্তব কেমন করিয়া স্বপ্নের কোঠায় গিয়া পরে কবি সেইটি এখানে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন।

প্রতীচির কবিও স্বপ্নকে বাস্তবের খুব কাছে টানিয়া লইয়াছেন। স্বপ্ন বিপরীত ফলে, এইটি খুব আগেকার ধারণা। 'সাইলক্ দি জু' রাত্রে স্বপ্নে কতকগুলি টাকার থলি দেখিয়াছে, আর পরেই তার মেয়েটা কতক অলঙ্কারপত্র লইয়া সরিয়া পড়িল। স্বপ্ন আবার ঠিক্ ঠিক্‌ও ফলে। 'সিজার' গৃহিণী স্বামীকে দরবারে যাইতে দিবেন না ; তিনি গতরাত্রে বড় দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছেন। রক্ত ! রক্ত !! রক্ত !!! রক্ত দিয়া যেন সিজারের প্রতিমূর্ত্তি স্নাত। এ স্বপ্ন দেখিয়া পতিপ্রাণা গৃহিণী স্বামীকে কি করিয়া ছাড়িয়া দিবেন। আজ সিজারেরও মন টলিল হয় ত স্বপ্নবৃত্তান্তেই। কিন্তু শেষে দশজনের চক্ষে সিজার ছোট হইয়া যাইবে, ইহা কেমন করিয়া সম্ভব। সিজার সভায় গেলেন, ফল কি হইল ? স্বপ্ন সত্যের রুদ্রমূর্ত্তি ধরিল। সিজার ষড়যন্ত্রকারীর ছোড়ার আঘাতে নিহত হইলেন। সত্যই রক্তে রাঙ্গা হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন।

সেই ভীষণ রাত্রি ! যে রাত্রে 'ম্যাক্‌বেথ্' গৃহে রাজঅতিথি নিহত হন। গিন্নী ছোড়া হাতে করিয়া অতিথির বুকে বসাইবার জন্য একেবারে প্রস্তুত। ঠিক সেই সময়ে রাজার দেহরক্ষী স্বপ্নে। এ স্বপ্ন বাস্তবের ছায়া। ঘুমের চক্ষে বলিয়া উঠিল, খুন ! খুন !! সত্যকার খুনীর হাত কাঁপিয়া উঠিল।

স্বপ্নের এইরূপ ভৈরব মূর্ত্তি সংস্কৃত নাটকে নাই বলিলে দোষ হয় না। বাণভট্ট তাঁর

তাহাও স্বপ্নাকুল। স্বপ্নে দেখিলেন অভ্রস্পর্শি একটি লৌহ স্তম্ভ কোন্ এক অজানিত কারণে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। প্রভাতেই সংবাদ আসিল শ্রীহর্ষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গৌড়ের দুষ্ট রাজা দ্বারা নিহত। এবারে স্বপ্নের তত্ত্ব বোঝা গেল।

ভাস কবির "স্বপ্ন বাসবদত্তায়" স্বপ্নরাজ্যের সহিত বাস্তব জগতের বেশ মধুর সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে। উদয়নের অতি আদরের বাসবদত্তা আর নাই। রামাণকের অকরুণ অগ্নি নাকি তাহাকে গ্রাস করিয়াছে। মন্ত্রী রুমন্বানের চতুরতায়—মহাভাগ্যবতী পদ্মাবতীর সহিত উদয়নের বিবাহ শেষ হইয়াছে। উদয়ন শ্বশুরালয়ে আছেন। সেদিন পদ্মাবতীর মাথা ধরিয়াছে। পরিচারিকা বলিয়া গেল 'সমুদ্র গৃহে' ভর্তৃদারিকার শয্যারচনা করা হইয়াছে। উদয়ন তাহাকে দেখিতে সেখানে উপস্থিত। শয্যা যেমন তেমনই আছে। কেহ যে ঘরে আসিয়াছিল, তার চিহ্নমাত্র নাই। বিদূষকের গল্প শুনিতে শুনিতে রাজা ঘুমাইয়া পড়িলেন। একটু শীত বোধ হওয়ায় গায়ের কাপড়খানা আনিবার জন্য বিদূষক চলিয়া গেল। বাসবদত্তা মরে নাই। কৌশলী সেনাপতি যৌগন্ধরায়ন তাঁহাকে লুকাইয়া পদ্মাবতীর কাছে রাখিয়া দিয়াছিল। পদ্মাবতী অসুস্থ শুনিয়া তিনিও 'সমুদ্র গৃহে' আসিলেন। দেখিলেন ঘরে কোন পরিজন নাই। শয্যায় আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত কে ঘুমাইতেছে। ভাবিলেন পদ্মাবতী। ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া বসিলেন, পরে তাঁর পাশে শুইলেন।

এবারে রাজা স্বপ্নে বকিতেছেন, "হায় বাসবদত্তা," বাসবদত্তা আপনার ভুল বুঝিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন। রাজা তখনও স্বপ্নে, "অবন্তিরাজপুত্রি, তুমি কি কথা কহিবে না? তুমি রাগ করিয়াছ? যদি রাগ না করিবে তবে বেশ রচনা কর নাই কেন? তুমি "বিরচিকা"র কথা মনে করিয়া মান করিয়াছ, এস এস কাছে এস।" রাজা হাত বাড়াইলেন। তন্দ্রাশিথিল হাত অই ভাবেই রহিল। বাসবদত্তা ভাবিলেন খুব হইয়াছে। কে আসিয়া পড়িবে। হাতখানা সরাইয়া রাখিয়া সরিয়া যাই। হাত সরাইয়া চলিয়া যাইতেছেন, রাজারও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেছে। 'হা বাসবদত্তা' বলিয়া ছুটিয়া যাইবেন, দ্বারে বাধা পাইয়া ফিরিলেন। বিদূষক গায়ের কাপড় লইয়া ফিরিয়া আসিল। রাজা তাহাকে বলিলেন "বাসবদত্তা মরে নাই, সে এইমাত্র স্বপনের মধ্যে দেখা দিয়া কোথায় লুকাইয়া গেল। রুমন্বান নিশ্চয়ই মিথ্যা বলিয়াছে। বিদূষক বলিল 'এ খাঁটি স্বপ্ন! বাসবদত্তা বাঁচিয়া নাই; থাকিতে পারে না। তখনও প্রিয়-সুখস্পর্শে রাজার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত; তিনি ভাবিলেন "যদি তাবদয়ং স্বপ্নো ধন্যমপ্রতিবোধনম্।"—স্বপ্নই ছিল ভাল।

"উত্তর রামচরিতে" ভবভূতি স্বপ্ন ও জাগ্রতের রেখাটিকে সুন্দর করিয়া তুলিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সীতাকে নির্ব্বাসন দিয়া রাম বিরহ বিধুর। কোথাও শান্তি নাই। বাল্মীকির তপোবনে বেড়াইতেছেন, যদি সান্ত্বনা পাওয়া যায়। সঙ্গে সীতার প্রিয় সহচরী বাসন্তী। সীতাও তপোবনেই কিন্তু ভাগীরথীর প্রভাবে তিনি লোক নয়নের অদৃশ্য। অন্য পরের কথা নাই,

বনদেবতারাও তাঁহাকে দেখিতে পান না। তিনি সখী তমসার সঙ্গে বেড়াইতেছেন। নিকটেই শ্রীরামের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তিনি 'হা জানকী, হা প্রিয়া' বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তমসা বলিলেন, সখি যাও, শ্রীরামের গায়ে হাত বুলাইয়া দেও, তবেই উহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইবে। মর্ম্মাহতা সীতা কাছে গিয়া বসিলেন ও গায়ে হাত বুলাইলেন। রামের চৈতন্য হইল। তিনি ভাবিলেন, এ কার স্পর্শ, কে আমার তপ্তদেহে চন্দন প্রলেপ দিয়া দিল। সীতা ভিন্ন কার স্পর্শ এমন স্নিগ্ধ-শান্ত-সুখকর। চেষ্টা করিলেন, ধরিবেন বলিয়া। হায়, সীতা বাতাসের সঙ্গে সকলের অগোচরে কোথায় মিশিয়া গেল। রাম বাসন্তীকে বলিলেন, সত্যই সীতা তাঁহার কাছে বসিয়াছিল, সত্যই তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিয়াছে। বাসন্তী তাহা বিশ্বাস করিবে কেন? বলিল, আয়ুস্মন্ এ "আপনার ভ্রম, আপনি মূর্চ্ছিত হইয়া সীতাকে স্বপ্নে দেখিতেছিলেন।" রামও প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাবিলেন, "তাইত, সীতা আসিলে বাসন্তী অবশ্যই দেখিত ও চিনিত। বুঝি এ স্বপ্নই হইবে। তাই বা কেমন করিয়া হয়, আমিত ঘুমাইয়াছিলাম না। জাগ্রতে কি স্বপ্ন হইতে পারে? তবে কল্পনা-প্রসূত ভ্রমেই আমাকে এমন করিয়াছে।"

কবি বুঝাইলেন জাগ্রতেও স্বপ্ন দেখা যায়। মানুষ আপনাকে হারাইয়া প্রমত্ত হয়। মনে করে ঠিক্ জাগ্রত আছি। সত্যকার স্বপ্ন-রাজ্যের বিষয়গুলি ভোগ করিতে যাইয়া প্রতিহত হইয়া যখনই ফিরিয়া আসে তখনই আবার বলে না, অই-টি আমার ভুল।

বাস্তব জীবনে যেমন স্বপ্ন অনেকখানি স্থান জুড়িয়া বসিয়া আছে, বাস্তবের ছায়াস্বরূপ নাট্যেও তেমনি স্বপ্ন অনেকটা জায়গা দখল করিয়া আছে। নাট্যের বিকাশ এবং অভিব্যক্তির জন্য কবিকে যে অনেক সময় স্বপ্নের আশ্রয় নিতে হয়, তাহার প্রমাণ উপরি উদ্ধৃত কয়েকটী দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যাইবে।

দিনান্তে

(শ্রীবিধুশেখর দাস)

সেদিন তখন শেষ ফাগুনের বিদায় অলস বেলা
মাঠের রাখাল ফিরছে গোঠে, ভাঙ্ছে ছেলের খেলা,
বিজন মাঠের একটী পথিক চল্‌ছি শুধুই আমি.
আকাশ পটে রক্ত-রাঙা তপন অস্তগামী।
মুমূর্ষুর শেষ উদ্‌গারিত একটী ঝলক রক্ত মত
দিক্‌বিদিকে ছড়িয়ে গেছে অস্তরবির রশ্মি যত।
খুন-করা অই সূর্য্যেরি হায় রক্ত ঝরে টল্ টল্,
ছিটুকে পড়ে দিগন্তরে, গায় মেখে লয় মেঘের দল।
শীতের শেষে প্রায়াগত সন্ধ্যা-ধূসর কোয়াসা
মাঠের বুকে গাছের শিরে বনের ফাঁকে বাঁধ্‌ছে বাসা।
অস্তাচলের সিঁদুর-লেখা পড়ছে সাদা মেঘের গায়,
ফাগ অভিনয় করছে কারা ফাগুন দিনের শেষ বেলায়।
পশ্চিমের অই আকাশ ভরে গাছের চূড়ায় লতায় পাতায়
নন্দন হোতে অপ্সরীরা মন্দার রেণুর ফাগ ছড়ায়।
সন্ধ্যার বুঝি দিগ্‌বালারা খেলছে হোরী মাঠটা জুড়ে,
দিনের রাখাল তাড়ায় গো-পাল রাঙা মাটীর গো-ধূল উড়ে।
আঁচল টেনে ঘুম পাড়ায় সন্ধ্যা-বঁধু ধরিত্রীরে,
আমি তখন ধর্‌ছি এঁটে মাঠের বুকের পথটীরে।

কি খাইব

(শ্রীঅনুকূল চন্দ্র সরকার, এম, এ ; পি, এইচ, ডি)

প্রবন্ধের নামটা পাঠ করিয়াই হয়তো কেহ কেহ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন। যাঁহারা ছাত্রাবাসে অবস্থান করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ হয়তো বলিবেন "কেন? তৈল ও [illegible]াথা বাদে চৌদ্দ আনা মূল্যে ক্রীত এবং ৮০ খণ্ডে কর্ত্তিত রোহিত মৎস্যের একখণ্ড ও উচ্চ ক্রমের হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত প্রণালীর আদর্শ অনুকরণে প্রস্তুত মুশুরী ডাইল নামক তরল পদার্থের যথেচ্ছ পরিমাণ সহ ভাত খাইব!" বয়োবৃদ্ধ ও [illegible]দের মধ্যে কেহ হয়তো বলিবেন, "কে কি খাইবে এ আবার একটা আলোচনার বিষয় কি? [illegible] যেরূপ উপার্জ্জন করিবেন তিনি সেরূপ খাইবেন। তবে যদি কেহ বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত [illegible] [illegible]ডাডের চন্দ্রের মত ভাগ্যবান্ হন, তিনি অবশ্য ভুড়ও খাইতে পারেন এবং টামাক ও খাইতে পা[illegible]" অধ্যাপকবর্গের মধ্যে হয়তো কেহ বলিবেন "খাদ্য সমস্যা বা বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ অন্নসংস্থান প্রভৃতি হইতেছে অর্থনীতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় বিষয়। এ-সব বিষয়ে চিন্তা অর্থাৎ মৌলিক গবেষণা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক উপযুক্ত লোক নিযুক্ত রহিয়াছেন। রসায়ন শাস্ত্রাধ্যাপকের পক্ষে এ-সব সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া অনধিকার-চর্চ্চা মাত্র।"

এমতাবস্থায় প্রবন্ধের নাম মনোনয়ন সম্বন্ধে আমার একটী কৈফিয়ৎ দেওয়া কর্ত্তব্য। যাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক কৃপা পরবশ হইয়া এই প্রবন্ধটী আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন, তাঁহারাই বিচার করিবেন যে প্রবন্ধটার উক্তরূপ প্রশ্নবোধক নাম নির্ব্বাচনের অধিকার আমার আছে কি না।

প্রায় বাল্যকাল হইতেই আমার প্রাণে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা যে আমি বেশ অনেক দিন বাঁচি অর্থাৎ খুব দীর্ঘজীবী হই। এই আকাঙ্ক্ষাটা প্রবলতর করিয়া তোলার জন্য দায়ী হইতেছেন আমার কোষ্ঠী প্রস্তুতকারক মহাশয়। কোষ্ঠীতে তিনি আমার পরমায়ুঃ সম্বন্ধে যে সংখ্যাটা সন্নিবেশ করিয়া গিয়াছেন তাহা মোটেই আমার পছন্দ মত হয় নাই। একেত গ্রহবিপ্র মহাশয় ছিলেন নিতান্ত সেকেলে এবং গ্রাম্য; আধুনিক অর্থাৎ অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা পূর্ব্বক কোষ্ঠী প্রস্তুতের প্রণালীটা তাঁহার জানা ছিল না। তারপর ব্যক্তি বিশেষের দেহের কখন কি হইবে ইত্যাদি শারীর-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বিষয় প্রসঙ্গে কোনও কিছু বলার অধিকার বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে বৈজ্ঞানিক ব্যতীত আর কাহারও যে নাই, সে কথাটা তাঁহাকে বুঝাইয়া সংখ্যাটাকে যে ইচ্ছানুরূপ বদলাইয়া লইব সে সুযোগও ঘটিয়া উঠে নাই,

কারণ লোকটা ছিলেন বৃদ্ধ, এবং যে বৎসর আমি মাতৃকুলাশন পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া আচার্য্যজ্ঞানের পদার্থ বিজ্ঞান (Ganots Physics) পাঠ আরম্ভ করিলাম, সেই বৎসরই তিনি গেলেন মারা। ইহার ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, সেই সেকেলে গ্রাম্য, বুড়া গণকঠাকুর আমার পরমায়ুঃ সম্বন্ধে (খুব সম্ভবতঃ কোনও রূপ গাণিতিক ভুলে) যে সংখ্যাটা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন তাহাই অপরিবর্ত্তিত ভাবে এখনও কোষ্ঠীর কলেবরে বিরাজ করিতেছে এবং আমার বয়স যতই ঐ সংখ্যাটার নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে, আরও কিছু বেশী দিন বাঁচিয়া থাকার আকাঙ্ক্ষাটাও আমার ততই প্রবলতর হইতেছে।

বিজ্ঞান ফলিত শাস্ত্র। এ ক্ষেত্রে কল্পনার স্থান নাই। যাহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত বৈজ্ঞানিকের নিকট একমাত্র তাহাই গ্রাহ্য। বৈজ্ঞানিকগণের মতে দেহরূপ যন্ত্রটাকে কার্য্যক্ষম অবস্থায় রাখিতে হইলে যাহা যাহা করা প্রয়োজন, তাহা নিয়মিত ভাবে পালন করিলেই আমরা দীর্ঘজীবী হইতে পারি। চিরঞ্জীবত্ব সমস্যা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্ত ও কি উপায়ে দীর্ঘজীবন লাভ করা যায় তদ্বিষয়ে তাঁহাদের নির্দ্দেশ সমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং বৈজ্ঞানিকগণের নির্দ্দেশানুযায়ী কাজ করিয়া আমি নিজে কিরূপ ফল পাইয়াছি, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করা হইতেছে বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। অবশ্য আপনারা আমার এই প্রবন্ধটাকে 'ছোট গল্প' বা 'অধ্যাপকের আত্মকাহিনী' বা 'লঘু সাহিত্য' বা 'বিপন্নের আবেদন' বা 'বৈজ্ঞানিক যৎকিঞ্চিৎ' বা এক কথায় বলিতে গেলে সর্ব্বতন্ত্রের শেষতত্ত্ব প্রত্নতত্ত্ব ছাড়া আর যাহা অভিরুচি তাহা বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারেন।

আমরা দেখিতে পাই সময়ে মানুষ মাত্রেরই দেহে বার্দ্ধক্য নামক এমন একটা অবস্থা আসে যাহার কবল হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই এবং যাহার শেষ হইতেছে মৃত্যু। অর্থাৎ বার্দ্ধক্য অগ্রদূত-রূপে মৃত্যুর সমীপাগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া থাকে। আবার ইহাও দেখা যায় যে কেহ হয়তো চল্লিশ বৎসর বয়সেই বুড়া হইয়া পরেন এবং কাহারও দেহে বার্দ্ধক্যের লক্ষণনিচয় উহার বহু পর পর্য্যন্তও প্রকাশ পায় না। অতএব দেখা যাইতেছে যাহার দেহে বার্দ্ধক্য যত গৌণে প্রকট হইবে তিনি তদনুপাতে দীর্ঘজীবী হইবেন।

এ স্থানে প্রশ্ন হইতে পারে যে বার্দ্ধক্য কাহাকে বলে? বার্দ্ধক্য দৈহিক জড়ত্বের নামান্তর মাত্র এবং উহা কতকগুলা অভিদ্যোতক লক্ষণ দ্বারা বিজ্ঞাপিত হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেহে কি ভাবে এবং কি কি পরিবর্ত্তন হয় তৎসম্বন্ধে শারীর-সংস্থান-বিদ্যা-বিশারদ ও শারীর-বিধান-তত্ত্ববিদ্‌গণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে ক্রমে এমন একটা সময় আসে যখন দেহের বিভিন্ন অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ সমূহ আর যথোচিত ভাবে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না। অর্থাৎ উহাদের কার্য্যকরী শক্তির হ্রাস পাইয়া থাকে। দেহের এই অবস্থাকেই বার্দ্ধক্য বলা হয়। এতদ্‌সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার

স্থান নাই। তবে মোটামুটি ভাবে আমরা দেখিতে পাই যে পরিণত বয়সে দেহের উচ্চতা খর্ব্ব হইতে থাকে এবং দেহটা ক্রমেই সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে।

পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে যৌবনে কাহারও দেহের উচ্চতা ১৭৪ ধরিলে, ৭০ বৎসর বয়সে উহা কমিয়া ১৬১ তে দাঁড়ায়। প্রায় ৪০ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় হইতে মেরুদণ্ড ক্রমেই বক্রভাব ধারণ করিতে ও সঙ্কুচিত হইতে থাকে বলিয়াই উক্তরূপ দেহের উচ্চতা হ্রাস পায়। বার্দ্ধক্যের আর একটী সুস্পষ্ট লক্ষণ হইতেছে দ্রুততর হৃদয়স্পন্দন; অর্থাৎ কোনও নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে (যথা এক মিনিটে) একজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তির হৃদয় যতবার স্পন্দিত হয়, তাহার তুলনায় ঐ সময় মধ্যে একজন বৃদ্ধের হৃদয় অধিকবার স্পন্দিত হইয়া থাকে এবং উহা আভ্যন্তরীণ দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক। এতদ্ব্যতীত বার্দ্ধক্যে দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, স্মৃতিশক্তি প্রভৃতির হ্রাস হয় এবং আরও নানাপ্রকার দৈহিক জড়ত্বের পরিচায়ক লক্ষণ প্রকাশ পায়। অতএব দেহস্থিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমুহের কার্য্যকরী শক্তি যদি অবিকৃত ভাবে রাখা যায় তাহা হইলেই বার্দ্ধক্য আসিতে পারে না এবং দীর্ঘজীবী হওয়া যায়। কিন্তু উক্তরূপ ব্রতে সিদ্ধ হইতে হইলে প্রথমে কারণ সমুহের অনুসন্ধান করিয়া তদনুযায়ী ব্যবস্থাপূর্ব্বক অগ্রসর হইতে হইবে। বয়োবৃদ্ধি সহকারে দৈহিক, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তন সমুহ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ চূড়ান্ত প্রামাণিক ব্যাখ্যাপ্রদান করিয়াছেন। এস্থলে একটী মাত্র উদাহরণ প্রদত্ত হইল। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে বার্দ্ধক্যে হৃদয়ের স্পন্দন দ্রুততর হইয়া থাকে। দেহরূপ জটিল যন্ত্রটার পরিচালন কেন্দ্র হইতেছে হৃদ্‌পিণ্ড বা রক্তাশয়। এই মর্ম্মস্থান হইতেই ধমনী (arteries) * সমূহদ্বারা দেহের বিভিন্ন অংশে রক্ত সঞ্চালিত হইয়া থাকে। কিন্তু পরিণত বয়সে রক্তবহানারী বা জীবিতজ্ঞা সমুহের আর পূর্ব্বের ন্যায় স্ফূর্ত্তিযুক্ততা থাকে না। উহারা ক্রমে আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। তখন বাধ্য হইয়া উহাদের মধ্য দিয়া দেহের বিভিন্ন অংশে প্রয়োজনোচিত রক্ত প্রেরণ করিতে হৃদ্‌পিণ্ডের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শক্তি প্রয়োগ করিতে হয় বলিয়াই হৃদস্পন্দন দ্রুততর হইয়া থাকে। উক্তরূপে সাধ্যানুযায়ী পরিশ্রম করিতে করিতে অবশেষে হৃদ্‌পিণ্ডও ক্লান্ত বা অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রীড়া বন্ধ হইলেই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে স্নায়ুমণ্ডলীর দার্ঢ্য (Arterial sclerosis) হইতেই দৈহিক জড়ত্বের উৎপত্তি। এইরূপে বার্দ্ধক্যের অন্যান্য লক্ষণাবলীর আবির্ভাবের কারণ সম্বন্ধেও প্রামাণিক ব্যাখ্যা সমাহৃত হইয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ধমনী সমূহের শীর্ণতা (Atroply) বা দুর্ব্বলতা হইতেই উহাদের উৎপত্তি।

* ধমনী রক্তবাহিণী, বায়ুবাহিণী, রক্তবহানাড়ী, রোহিণী জীবিতজ্ঞা একই অর্থবাচক ও ইংরেজীতে Artery পারিভাষিক শব্দ।

বিবৃতভাবে একমত না হইলেও ধমনীর জড়তাই যে বার্দ্ধক্যের কারণ তদ্বিষয়ে স্থূলতর বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই। অধ্যাপক অস্‌লার (Prof. Osler) এক কথায় দীর্ঘায়ুঃরহস্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। "Longevity is a vascular question and a man is only as old as his arteries" † অর্থাৎ রক্তবহানাড়ী মণ্ডলীর উপর জীবন নির্ভর করিতেছে এবং উহাদিগকে কর্ম্মক্ষম রাখিতে পারিলেই দীর্ঘজীবী হওয়া যায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে স্নায়ুমণ্ডলীর জড়তা (arterial atreyshy) প্রতিরোধ করিতে পারিলেই চিরঞ্জীবত্ব লাভ করা যায়।

মূল উদ্দেশ্য অনুরূপ হইলেও বৈজ্ঞানিকগণ কর্ত্তৃক ধমনী নিচয়ের পূর্ব্বোল্লিখিতরূপ জড়তা স্থগিত রাখার পন্থা বিভিন্নরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ দীর্ঘজীবন লাভ করিতে হইলে কি করা কর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ ভিন্ন ভিন্ন রূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। অবশ্য উহাদের মধ্যে কোন্‌টি যে শ্রেষ্ঠ বা সমীচীন তাহা বলা না গেলেও উহাদের কোনটাকেই উপেক্ষা করা যায় না। কারণ বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্ত সমূহ সর্ব্বদাই পরীক্ষামূলক প্রামাণিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যাহা হউক উপরি লিখিত ব্যবস্থা সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও উহাদের অনুসরণ করিয়া আমি কি প্রকার অচিন্ত্যপূর্ব্ব ফল পাইয়াছি তাহার কিঞ্চিৎ আভাস নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১)

দেহরূপ যন্ত্রটার পরিচালনার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, আমাদের খাদ্য হইতে তাহা সংগৃহীত হয়। আমাদের ভুক্তদ্রব্যের অধিকাংশ শান্তভাবে প্রতিনিয়ত পুড়িয়া শরীরের পেশী সকলকে কর্ম্মশক্তি (Energy) দান করে এবং কয়লা পুড়িয়া যেরূপ কিছু ছাই অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ ঐ খাদ্য দগ্ধ হইয়াও কিছু আবর্জ্জনা পশ্চাতে ফেলিয়া রাখে। এই আবর্জ্জনাভাগকে নিয়মিতভাবে দেহ হইতে বাহির করিয়া না দিতে পারিলে উহারা পেশীসমূহে সঞ্চিত হইয়া উহাদের উপর বিষক্রিয়া করিয়া থাকে এবং উহাদের কর্ম্মশক্তি হ্রাস করিয়া দেয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে দেহ হইতে অপ্রয়োজনীয় পদার্থ বা আবর্জ্জনা রাশির নিয়মিত উৎসর্জ্জনের উপর আমাদের জীবন নির্ভর করিতেছে। অধ্যাপক মণ্টগোমারি (Prof. T. H. Montgomery) বহু পরীক্ষা করিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল। "Natural death of the individual results from self-poisoning. The waste products of metabolism accumulate in the tissues until there results a true intoxication of the latter. Death follows on account of the insufficiency of the excretion process ; therefore the limit of life is a matter of excretion."

† Osler "The principles and Practice of medicine" P P 666.

বৈজ্ঞানিকগণের নির্দ্দেশ যে কোনও নর্দ্দমায় আবর্জ্জনা জমিলে যেরূপ জল ঢালিয়া উহা স্থানান্তরিত করিতে হয়, সেইরূপ দেহরূপ বিরাট অন্দর মহলের প্রত্যাখ্যাত উচ্ছিষ্টরাশিকে একমাত্র জলদ্বারা ধৌত করিয়াই দূর করিয়া দেওয়া যায় এবং তজ্জন্য প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণ জল পান করা দরকার। কিছু দিন পূর্ব্বে নিউইয়র্ক সহরের একটী স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সরকারী ইস্তাহারেও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে,—"প্রত্যহ অন্ততঃ ছয় গ্লাস করিয়া শীতল জল পান করিও"। বলাবাহুল্য বিশেষজ্ঞগণের উপদেশ মতই গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এই আদেশ বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থাটী বাহ্যতঃ এত সহজ, সুলভ ও সাধারণ যে, অনেকে হয় তো উহার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইবেন। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে যাঁহারা সুস্থ তাঁহারা যদি দেহকে চিরদিন সুস্থ রাখিতে অর্থাৎ দীর্ঘজীবী হইতে বা দেহকে ক্রমশঃ সুস্থতর করিতে অর্থাৎ নবতারুণ্য লাভ করিতে (rejuvenation) চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রচুর পরিমাণ জল পান একান্ত কর্ত্তব্য। 'প্রচুর পরিমাণ' অর্থে দিবসে অন্ততঃ ছয় গ্লাস বা তিন সের। অবশ্য এতদধিক জল পানে কোনওরূপ অনিষ্ট হয় না ; বরং উহা নবযৌবন-প্রদায়করূপে দেহের পক্ষে অধিকতর ইষ্টকর।

জলের প্রধান কার্য্য—উহা বৃহদন্ত্র হইতে শোষিত হইয়া রক্তধারার মধ্যে মিশিয়া গিয়া উহার মধ্য হইতে দ্রবণীয় বিষসমূহ সংগ্রহ করিতে করিতে আমাদের কুক্ষির উভয় পার্শ্বগত বৃক্কদ্বয়ে (Kidneys) আসে ; বৃক্কদ্বয় রক্তকে সুপরিষ্কৃত করিয়া ও উহার স্বাভাবিক মৌলিক ঘনতা সম্পাদন করিয়া, বিষমিশ্রিত জলীয়াংশ মূত্রাশয়ে (Bladder) পাঠাইয়া দেয়। এতদ্ব্যতীত জল শরীরের উত্তাপের সামঞ্জস্য রক্ষা করে ; দেহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশে সমানভাবে তাপ বিতরণ করে ; এবং অতিরিক্ত উত্তাপকে ঘামের মধ্য দিয়া বাহির করিয়া দিতে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে। তারপর, যে কোটি কোটি সূক্ষ্মতম প্রাণবন্তবৎ অনুকোষ সমূহ (cells) দ্বারা নির্ম্মিত এই যে দেহরাজ্য, সেইগুলি আমাদের কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমুহূর্ত্তে ক্ষয়িত, অকর্ম্মণ্য ও ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। এই মৃত অনাবশ্যক অনুকোষগুলি রক্তের মধ্যে মিশিয়া পরে চর্ম্ম, ফুস্‌ফুস্‌দ্বয়, বৃক্কদ্বয় ও অন্ত্রমধ্য দিয়া বহির্গত হইয়া যায়। জল ঐ সকল আভ্যন্তরিক যন্ত্রকে সক্রিয় ও সুস্থ রাখে, এবং শরীরে কোনওরূপ অপ্রয়োজনীয় বা দুষ্ট পদার্থ থাকিতে দেয় না। অর্থাৎ শরীরাভ্যন্তরের সর্ব্বপ্রকার ময়লা নিষ্কাষণ করিয়া দিতে জল অদ্বিতীয় এবং দেহের ভিতরে শত্রুর সন্ধান পাইলেই জল তাহাকে যে কোনও দরজা দিয়া হউক অর্দ্ধচন্দ্রদানে তাড়াইয়া দেয়।

আমরা যতটা জল পান করি তাহার ⅔ অংশ মূত্ররূপে নির্গত হইয়া থাকে। বাকি ⅓ অংশের কতকটা মলের সঙ্গে কতকটা ঘর্ম্মরূপে, এবং অবশিষ্টাংশ অসাক্ষাৎ ঘর্ম্মরূপে (Insensible perspiration) বাহির হইয়া যায়। শুচিবায়ুগ্রস্ত ঠাকুরাণীরা যেমন শরীরের বহিরাঙ্গ জলদ্বারা

ব্যক্তিগণেরও সেইরূপ দেহের ভিতরের যন্ত্রগুলিকে নির্ম্মল রাখিতে যত্নবান্ হওয়া উচিত এবং প্রচুর পরিমাণে শীতল জল পান করাই হইতেছে উহা করার একমাত্র উপায়।

৯৷১০ বৎসর পূর্ব্বে যখন বৈজ্ঞানিকগণের বাচনিক দীর্ঘজীবন প্রাপ্তির পূর্ব্বোক্তরূপ অজ্ঞাতপূর্ব্ব বা গুপ্ত পন্থাটা জানিতে পারি, তখন হইতেই উহা যথাসম্ভব অনুসরণ করিয়া আসিতেছি। ক্রমে অভ্যাসের ফলে বর্ত্তমান সময়ে আমি দৈনিক গড়ে ৫ সের বা কিঞ্চিদধিক ১০ পাউণ্ড করিয়া জল পান করি। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ শীতল জল পানের ব্যবস্থা দিয়াছেন। উহাদের দেশে স্বাভাবিক উষ্ণতা ১০ হইতে ১৫ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড্ (10—15°c)। আমাদের দেশে শীতকালেও বায়ুর উষ্ণতা ২৪ হইতে ২০ ডিগ্রী, সেণ্টিগ্রেডের নীচে নামিতে চাহে না। কাজেই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের ব্যবস্থাটার যথোচিত পালন করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা-প্রণোদিত হইয়া গ্রীষ্মকালের কথা দূরে থাকুক, প্রচণ্ড শীতকালেও আমি জলের সহিত বরফ মিশ্রিত করিয়া জলের উষ্ণতাটাকে হ্রাস করাইয়া পাশ্চাত্য জলের শৈত্যাবস্থায় আনিয়া তৎপর পান করিয়া থাকি। উক্তরূপ নিয়ম প্রতিপালনের ফলে আমার জীবনের দৈর্ঘ্য..কতটা বাড়িয়াছে তাহা বলিতে পারি না। তবে মোটামুটি যাহা অনুভব করিতেছি তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। অত্যধিক জল পানের ফলে আমার এত অধিক ঘর্ম্ম হয় যে আমি শক্ত গলচিহ্ন বা গ্রীবাচ্ছাদক (collar) ব্যবহার করিতে পারি না। কারণ নিঃসৃত ঘর্ম্মে সিক্ত হইয়া উহারা অত্যল্প কাল মধ্যেই নরম হইয়া পড়ে এবং রজক প্রদত্ত শ্বেতসার (starch) চট্‌চটে অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া গলদেশে একটা অভদ্রোচিত কণ্ডূয়ণ উৎপাদন করে। অবশ্য দীর্ঘজীবন লাভের তুলনায় এই সামান্য অস্বাচ্ছন্দ্য কিছুই নহে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে আমরা যতটা জল পান করি তাহার ⅔ অংশ মূত্ররূপে নির্গত হইয়া যায়। সাধারণ সুস্থব্যক্তি দৈনিক গড়ে পাঁচ হইতে ছয়বার এবং ৫৬ হইতে ৬০ আউন্স অর্থাৎ প্রায় ২ সের মূত্র ত্যাগ করিয়া থাকেন। কিন্তু অত্যধিক জল পান হেতু আমি দৈনিক গড়ে দশ হইতে বার বার এবং ৯০ হইতে ৯৫ আউন্স পর্য্যন্ত মূত্র ক্ষরণ করি। ইহার ফল দাঁড়াইয়াছে যে যখনই কোনও চিকিৎসক আমার কুটীরে শুভাগমন করেন, আমার মূত্রের পরিমাণের মাত্রাটা শ্রবণ মাত্র পরম হিতৈষীরূপে আমাকে ইঙ্গিতে অথচ সুস্পষ্টরূপে প্রতীতি করাইয়া দেন যে উক্ত মাত্রারূপ মূত্র নিঃসরণ মোটেই স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের পরিচায়ক নহে এবং অচিকিৎস্য বহুমূত্র রোগের পরিস্ফুট লক্ষণ। এই নিরুপক্রম ব্যাধির কবল হইতে রক্ষা পাইতে হইলে রোগের অঙ্কুরাবস্থা হইতে বিজ্ঞোচিত সাবধানতা গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং রোগটা কতদূর পরিণত হইয়াছে তাহা নির্দ্ধারণের জন্য অগৌণে মূত্র পরীক্ষা করিয়া তন্মধ্যস্থ দ্রাক্ষাসর্করার (Glucose) পরিমাণ নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক ভবিষ্যৎ চিকিৎসা প্রণালী অবধারিত করা আশু কর্ত্তব্য। এই অবস্থায় পড়িয়া চিকিৎসকগণের পরামর্শমতে প্রতিবার

অষ্ট রজতমুদ্রা দক্ষিণা প্রদান করিয়া বিগত ছয় বৎসর মধ্যে আমাকে একাদশবার মূত্র পরীক্ষা করাইতে হইয়াছে। বলা বাহুল্য দ্রাক্ষাশর্করা ত দূরের কথা আম্র বা কাঁঠালি শর্করারও চিহ্ন পর্য্যন্ত আমার মূত্রে আবিষ্কৃত হয় নাই।

(২)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আমাদের ভুক্তদ্রব্যের সমস্তটা দৈহিক উপাদানে পরিণত হয় না। কিয়দংশ আবর্জ্জনারূপে পড়িয়া থাকে এবং ক্রমে দেহের উপর বিষক্রিয়া করিয়া নানাপ্রকার রোগ ও জরা আনয়ন করে। কাজেই আমাদের খাদ্যদ্রব্য যদি এরূপ ভাবে নির্ব্বাচন করা যায় যে উহা দেহে সম্পূর্ণরূপে সমীকৃত (assimilated) হইতে পারে, তাহা হইলে আর আমাদের পূর্ব্বোক্ত কারণে কোনও রোগ হইবে না। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে মনুষ্যের স্বাভাবিক খাদ্য কি? বহু চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক এ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে নিরামিষাশী ব্যক্তিগণ যেমন সুস্থশরীরে দীর্ঘকাল জীবনধারণ করিতে পারেন, আমিষাশী ব্যক্তিগণ তাহা পারেন না। মৎস্য মাংস ভক্ষণদ্বারা মানবদেহে অতিশয় অনিষ্টকারক রোগ উৎপন্ন হয়। সিড্‌নি এইচ, বিয়ার্ড তৎপ্রণীত The testimony of science in favour of Natural and human diet (অর্থাৎ মানব জাতির বিজ্ঞানসম্মত কিরূপ আহার হওয়া উচিত) নামক গ্রন্থে বিভিন্ন দিক হইতে বিষয়টার অতি বিস্তৃত আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে দীর্ঘজীবন লাভ করিতে হইলে আমাদের আমিষ ভক্ষণের পরিবর্ত্তে নিরামিষ আহার করাই উচিত। উদ্ভিজ্জাত খাদ্যই মানবের স্বাভাবিক আহার্য্য। খাদ্য সম্বন্ধে এই নৈসর্গিক নিয়ম মানিয়া না চলাতেই মানবদেহে নানাপ্রকার রোগ ও অকাল বার্দ্ধক্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অধ্যাপক বেরণ কিউভার বহু পরীক্ষার পর নিঃসন্দিগ্ধভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে:— শারীর বিজ্ঞানানুযায়ী মানব শরীরের গঠন প্রণালী যেরূপ তাহাতে ফলমূলাহারী জীবের সাদৃশ্যই মানবে লক্ষিত হয়; মানবদেহ আমিষ (অর্থাৎ মৎস্য ও মাংস) ভক্ষণোপযোগীরূপে গঠিত নয়। মাংসাহারী জীবের সহিত মনুষ্যের পূর্ব্বকাল হইতে কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না বা ছিল না। শাকমূলাহারী জীবের ন্যায় মানবের শারীরিক গঠন। ডাক্তার জোষিয়া ওল্ডফিল্ড জীবনব্যাপী অনুধ্যানের পর বলিয়াছেন যে বিজ্ঞান স্পষ্টই প্রমাণ করিতেছে মানবেরা মাংসাশী * জীব নহে; পরন্তু ফলমূল ভক্ষণকারী। ফলমূল শাকসব্জীতে যে উপাদান আছে, মানব শরীরের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। মাংস অস্বাভাবিক খাদ্য; তজ্জন্য পাকস্থলী সম্বন্ধীয় নানা রোগ উৎপন্ন করে। মাংস গুরুপাক; মানবের পাকস্থলী এইরূপ গুরুপাক খাদ্য হজমের পক্ষে উপযোগী নহে। অপর দিকে মাংস উত্তেজক; যে সারধাতুদ্বারা

* মাংস শব্দ পশু মাংস ও মৎস্য মাংস উভয়কেই বুঝাইতেছে। এবং মাংসাশী ও আমিষাশী একই অর্থে (অর্থাৎ মৎস্য বা পশু মাংস ভক্ষণকারী) ব্যবহৃত হইয়াছে।

শরীরের শ্রীবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুঃ লাভ হয়, সেই বাস্তব তেজ মাংস ভক্ষণ দ্বারা নষ্ট হইয়া যায় এবং মানবের আয়ুও তাহাতে কমিয়া যায়। শতকরা ৯৯ জনই একমাত্র মাংস ভক্ষণের জন্য নানাবিধ কঠিন রোগে ভুগিয়া থাকে। কর্কটরোগ, ক্ষয়রোগ, দূষিত জ্বর, দদ্রু, কুষ্ঠ প্রভৃতি আমিষাশীদের মধ্যেই অনেকটা সীমাবদ্ধ। ডাক্তার হেগ্ ইংলণ্ডের একজন বিজ্ঞ, বহুদর্শী চিকিৎসক। তাঁহার প্রণীত "ইউরিক এসিড ও যোগের নিদান" নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়া জানা যায় যে একমাত্র ইউরিক এসিড (uric acid) হইতে গেঁটেবাত, পক্ষাঘাত, মাথাঘোরা, অঙ্গ অবশ স্নায়বিক-দুর্ব্বলতা, নানাপ্রকার বায়ুরোগ, মানসিক দুর্ব্বলতা, তন্দ্রা, শিরোঘূর্ণন, মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা, বাতব্যাধি, হাঁপানি, যকৃতের দোষ, বহুমূত্র প্রমুখ বহুরোগ উৎপন্ন হয়; ঐ সকল রোগ আরোগ্য হয় না। এতদ্ব্যতীত যকৃত ও মূত্রনালীকে অনেক সময় ইউরিক এসিড্ ধ্বংস করে। কোন্ খাদ্যে কি পরিমাণ ইউরিক এসিড্ থাকে তাহা সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার হেগ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে অর্দ্ধসের গোমাংসে ১৪ গ্রেণ ও পশুর অর্দ্ধ সের যকৃতে ১৯ গ্রেণ ইউরিক এসিড পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে শাক্‌সব্জীতে এই অম্ল পদার্থ নাই বলিলেই চলে। উক্ত চিকিৎসকের মতে মানব দেহে শত শত রোগ একমাত্র ইউরিক এসিড ভক্ষণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আর এক জন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক রবার্ট পাকস্ দেখাইয়াছেন যে মাংসে এমন এক প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য আছে যাহা ধীরে ধীরে শরীরে সঞ্চিত হইয়া উহাকে একেবারে নষ্ট করিয়া দেয়। প্রথমে পাকস্থলীর গোলযোগ এবং ক্রমে দৈহিক যন্ত্রাদিরও অবনতি ঘটিতে থাকে। এইরূপে ক্রমাগত আমিষ আহার দ্বারা নানারোগের উৎপত্তি হয়। মাংসে যে বিষাক্ত লবণময় পদার্থ আছে তাহা দ্বারা অল্প বয়স হইতেই দেহটা ব্যাধির লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়া পড়ে এবং ক্রমে দেহ-যন্ত্রটার এত অবনতি সাধিত হয় যে উহা নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে অর্থাৎ মৃত্যু ঘটে। উক্ত চিকিৎসকের মতে হৃদ্‌রোগ প্রভৃতি বহুবিধ রোগের একমাত্র কারণ মাংসজ বিষাক্ত লবণ (salt)। ডাক্তার পার্চেট, ডাক্তার লুকাস প্রমুখ বহু চিকিৎসক তাঁহাদের জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার পর একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে দুরারোগ্য অন্ত্রোপাঙ্গ প্রদাহরোগের (appendicities) একমাত্র কারণ হইতেছে মাংসাহার। নিরামিষাশীদের মধ্যে এই রোগ কখনও দেখা যায় না।

অতএব দেখা যাইতেছে যে বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্তানুসারে আমাদের নানাপ্রকারের দৈহিক ব্যাধি ও জড়তা বিকাশের একমাত্র কারণ হইতেছে আমিষাহার; অর্থাৎ আবাল্য নিরামিষাশী হইলেই মানব যৌবনময় দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে।

বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্ত সমূহ ছাড়িয়া দিলেও আমরা দেখিতে পাই যে শাখামৃগ, অজ অশ্ব, গো প্রভৃতি ফলমূল তৃণভোজী প্রাণীদের তুলনায় মাংসাশী সারমেয়, মার্জ্জার, ব্যাঘ্রাদি জন্তু সমূহের কতগুলি দৈহিক বিশিষ্টতা আছে। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা গেল। মাংসাশী প্রাণীদিগের দন্তসমূহ ক্রমসূক্ষ্মাগ্র, তীক্ষ্ণ ও ধারাল অর্থাৎ মাংসভক্ষণোপযোগী ভাবে গঠিত।

মর্কটাদি অপর শ্রেণীর জন্তুদিগের দন্তনিচয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের; উপরিভাগ তীক্ষ্ণ বা ধারালের পরিবর্ত্তে সটান ও চ্যাপ্টা, এবং কাজেই মাংসভক্ষণোপযোগী নহে। মাংসাশীদের দন্ত সমূহ ফাঁক ফাঁক এবং এমন ভাবে অবস্থিত যে মুখ বন্ধ করিলে উপরের দন্তগুলি নীচের দন্তগুলির ফাঁক মধ্যে এবং নীচের দাঁতগুলি উপরের দাঁতগুলির ফাঁক মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। এইরূপ ব্যবস্থা মাংস টানিয়া ছিঁড়িবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। নিরামিষাশীদের দন্ত সমূহ ঘনসন্নিবিষ্ট এবং খাদ্যদ্রব্য পিশিয়া বা চর্ব্বণ করিয়া গ্রহণের উপযোগী ভাবে গঠিত। মেষ, মহিষ, গর্দ্দভ প্রভৃতি জন্তুগণ ওষ্ঠ দ্বারা আকর্ষণ করিয়া জলপান করে এবং তৎকালে কোনও শব্দ হয় না। কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণীসমূহ ওষ্ঠ সাহায্যে পানীয় দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারে না; উহারা জিহ্বার সাহায্যে জল পান করিয়া থাকে এবং তৎকালে ‘স্তু’—‘স্তু’—‘স্তু’—এইরূপ একটা শব্দ হয়। মাংসাশী প্রাণীদের স্ত্রী পুরুষ ভেদে নাসারন্ধ্রের ঠিক নীচেই অল্প কএক গাছা দীর্ঘ কেশ থাকে। নিরামিষাশী প্রাণীদের মধ্যে ও-রূপ দেখা যায় না। মাংসাশী জন্তুর হস্তপদের নখ সমূহ অতি তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্মাগ্র অর্থাৎ অপর প্রাণী হত্যা করিয়া খাদ্য আহরণের উপযোগী ভাবে গঠিত। নিরামিষাশী প্রাণীদের হস্ত পদের নখাবলী প্রশস্ত ও মসৃণ এবং মোটেই ধারাল নহে অর্থাৎ আমিষাহার সংগ্রহের উপযোগী ভাবে গঠিত নয়!

উপরে মাংসাশী প্রাণীনিচয়ের যে কয়েকটি বিশেষত্বের উল্লেখ করা গিয়াছে মনুষ্যের মধ্যে তাহার কোনটিরও চিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে মনুষ্যের পক্ষে মৎস্য মাংস অস্বাভাবিক খাদ্য এবং উদ্ভিজ্জ বস্তু স্বাভাবিক খাদ্য।

আমরা আরও দেখিতে পাই যে নিরামিষাশী বিধবাগণ সাধারণতঃ নীরোগ ও দীর্ঘজীবী হন। ফলমূলাহারী সাধুসন্ন্যাসীরাও সাধারণতঃ দীর্ঘজীবী। জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষিদিগের নামের একটা তালিকা করিলে দেখা যায় যে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই নিরামিষাশী ছিলেন। পিথেগোরাস, প্লেটো, আরিষ্টটোল, সক্রেটিস্, হাইপেটিয়া, ব্রিচাস্, ডাইয়োগিনিস্, প্লুটার্ক, সেপেকন, জোরোষ্টার, মিল্টন, নিউটন, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, নেল্সন্, ওয়েলিংটন ইহাদের কেহই আমিষাহারী ছিলেন না। অবশ্য বুদ্ধ, চৈতন্য, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, নানক, প্রতাপ, শিবাজি এবং “মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ” অনুসরণে বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখক (যদিও অল্প কিছুদিনের জন্য মাত্র) যে নিরামিষাশী ছিলেন তাহার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

নিরামিষাশী হওয়াই যে দীর্ঘজীবন লাভের একমাত্র উপায়, ৬।৭ বৎসর পূর্ব্বে যখন এই তথ্যটা অবগত হই তখনই আমিষাহার পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। ভাতের আনুসাঙ্গিক রূপে দৈনিক ১২।১৪ টি হংস ডিম্ব * অল্পাধিক্ অর্দ্ধসের ভর্জ্জিত পেঁয়াজ ও উক্ত উদ্ভিজ্জ রস-সিক্ত সংহত মুসরি ডাইল কএক বাটি মাত্র ভক্ষণ করিয়া সার্দ্ধ দুই মাস অতিবাহিত

করিয়াছিলাম। আরও কিছু দিন এইভাবে চলিতে পারিলে কোষ্ঠীতে আমার যে আয়ুর সংখ্যাটা আছে তাহা অদৃশ্য হইত কি না এবং তৎস্থলে একটা নূতন বৃহত্তর সংখ্যার আবির্ভাব হইত কি-না, তাহা বলিতে পারি না। পূর্ব্ববর্ণিত ভাবে আড়াই মাস নিরামিষ ভোজনের পর কঠিন আমাশয় রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ি। তখন কলিকাতায় ছিলাম। চিকিৎসক সাহেব সিদ্ধান্ত করিলেন যে অত্যধিক ডিম্ব-ভোজন হেতু আমার বৃহদন্ত্রে এক প্রকার কৃমি জন্মিয়া উক্ত যন্ত্রটাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলিয়াছে এবং বাঁচিবার কিঞ্চিন্মাত্রও ইচ্ছা থাকিলে আমাকে ডিম্ব ভক্ষণ চিরকালের জন্য ত্যাগ করিতে হইবে। তারপর ষোড়শ রজত মুদ্রা দক্ষিণাগ্রাহী চিকিৎসক সাহেব কর্ত্তৃক অণুবিক্ষণযন্ত্র সাহায্যে দৈনিক দুইবার করিয়া আমার মত দুই শত টাকা বেতন ভোগী শিক্ষকের আমাশয়ের মল পরীক্ষা, শলাকা দ্বারা আমার দেহের বিভিন্ন স্থানে নানাপ্রকার অজ্ঞাত নামা ঔষধের অন্তর্নিক্ষেপ, প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক-প্রণালী অনুমোদিত চিকিৎসা একমাস করার পর পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাই।

(৩)

বায়ুর সহিত আমাদের শরীরের অতি নিকট সম্বন্ধ বর্ত্তমান। প্রত্যেক নিশ্বাস গ্রহণের সময় আমরা শরীর মধ্যে বায়ু গ্রহণ করিয়া থাকি এবং প্রশ্বাসকালে তাহা পরিত্যাগ করি। বায়ু শরীরের পক্ষে এতই আবশ্যকীয় যে শরীরের দুইটি প্রধান যন্ত্র (ফুস্ ফুস্) সদাসর্ব্বদা বায়ু গ্রহণের জন্য নিযুক্ত আছে। বায়ু প্রধানতঃ অম্লজান (শতকরা ২১ ভাগ) ও যবক্ষারজান (শতকরা ৭৯) নামক দুইটি অনিল-পদার্থের সংমিশ্রণে গঠিত। বায়ুতে সামান্য পরিমাণ জলীয়বাষ্প, "কার্ব্বন ডাইঅকসাইড গ্যাস" প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে। নিশ্বাস গ্রহণকালে যে বায়ু ফুস্ ফুস্ মধ্যে গৃহীত হয়, রক্ত তাহা হইতে কিয়ৎ পরিমাণ অম্লজান (Oxygen) শোষন করিয়া লয়। এই অম্লজান রক্তের সহিত শরীরের বিভিন্ন প্রদেশে চালিত হইয়া উহার পুষ্টি সাধন করে। অম্লজান শরীরের অঙ্গার (Carbon) জাতীয় পদার্থ সমূহের সহিত মিলিত হয় এবং এই রাসায়নিক সংযোগ হইতেই শরীরের উত্তাপ ও শক্তির উৎপত্তি। অঙ্গার ও অম্লজানের সংযোগে শরীরাভ্যন্তরে কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড্ নামক যে বাষ্পাকার পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা দেহের পক্ষে অনিষ্টকারী। উহা রক্তের দ্বারা ফুসফুসে নীত হইয়া প্রশ্বাসের সহিত শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়। এই কারণে আমাদের নিশ্বাসবায়ু ও প্রশ্বাসবায়ু এতদুভয়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ লক্ষিত হয়।

যে বায়ু নিশ্বাসের সহিত গৃহীত হইলে শরীরের অনিষ্ট সাধিত হয়, তাহাকে দূষিত বায়ু বলা হয়। সাধারণতঃ যে যে কারণে বায়ু দূষিত হইয়া থাকে নিম্নে তাহার উল্লেখ করা গেল—(১) অম্লজানের অভাব ; (২) কার্ব্বন ডাইঅক্সাইডের আধিক্য ; (৩) জলীয়

বাষ্পের অভাব বা আধিক্য ; (৪) অনিষ্টকর বাষ্পের সংমিশ্রণ ; (৫) বায়ুতে ধূলিকণার বা অন্য কোনও ভাসমান পদার্থের আধিক্য ; এবং (৬) রোগ বীজাণুর বিদ্যমানতা।

দেহযন্ত্রটা অবিশ্রান্ত ভাবে কাজ করিতেছে এবং তজ্জন্য শক্তির প্রয়োজন হইতেছে। দেহাভ্যন্তরে অম্লজান যে সকল রাসায়নিক সংযোজন, বিয়োজন ক্রিয়া ঘটাইয়া থাকে তাহা হইতেই উক্ত শক্তির উৎপত্তি। মুহূর্ত্তের জন্যও প্রয়োজনোচিত শক্তির অভাব হইলেই দেহযন্ত্রটার কাজ বন্ধ হইয়া যায় অর্থাৎ মৃত্যু ঘটে। আমরা বায়ু হইতেই নিশ্বাসের সঙ্গে উক্ত অম্লজান দেহাভ্যন্তরে প্রেরণ করিয়া থাকি। অতএব দেখা যাইতেছে যে বায়ুই হইতেছে জীবের জীবন। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে কোনও খাদ্য গ্রহণ না করিয়াও ৫০ দিন পর্য্যন্ত এবং বিন্দুমাত্রও জলপান না করিয়া ৩ দিন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকা যায়। কিন্তু পাঁচ মিনিটের জন্য নিশ্বাস গ্রহণ কোনও কারণে বন্ধ হইলে আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হই। চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকগণের মতে আমরা নিজেরাই অজ্ঞতাবশতঃ বায়ুকে দূষিত করি এবং এই দূষিত বায়ু সেবন করিয়া নানারূপ পীড়াগ্রস্ত হই। দূষিত বায়ু সেবনের ফলে শিরঃপীড়া, বমনেচ্ছা, ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণতা, অনিদ্রা ও সময়ে সময়ে উদরাময় প্রভৃতি নানাপ্রকার উপদ্রব উপস্থিত হয়। সর্দ্দি, ব্রন্‌কাইটিস্‌, নিউমোনিয়া প্রভৃতি ব্যাধি বায়ুস্থিত বীজাণু দ্বারাই উৎপন্ন হয়। যক্ষ্মাবীজাণু অধিকাংশ স্থলে নিশ্বাসের দ্বারা ফুসফুসে উপনীত হয় ও যক্ষ্মারোগ জন্মায়।

স্বাস্থ্যনীতি অনুসারে গৃহমধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির অন্ততঃ ১০০০ ঘনফুট বায়ু আবশ্যক এবং ঘণ্টায় অন্ততঃ তিনবার এই বায়ুর পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত অর্থাৎ ঘণ্টায় ৩০০০ ঘনফুট বায়ু প্রত্যেক ব্যক্তি কলুষিত করে। ১০ ফুট লম্বা ১০ ফুট প্রশস্ত ও ১০ ফুট উচ্চ একটি ঘরে কেবল মাত্র এক ব্যক্তির শয়ন করা কর্ত্তব্য।

বৈজ্ঞানিকগণের মতে নিয়মিত ভাবে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিলে সহজে কোনও রোগ দেহে প্রবেশ করিতে পারে না। বিশুদ্ধ বায়ুর প্রভাবে শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রাদির ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। আমাদের দেহস্থিত রক্ত প্রভৃতি উপাদান সমূহের একটা বিশেষত্ব এই যে উহাদের মধ্যে ব্যাধি নির্ম্মূল করিবার শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। উহারা যখন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে তখনই মাত্র দেহে ব্যাধি বা জরা প্রবেশ করিতে পারে। বিশুদ্ধ বায়ু উহাদিগকে নূতন সজীবতা বা কর্ম্মক্ষমতা প্রদান করিয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে একমাত্র বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে পারিলেই জীবদেহে সহজে কোনও ব্যাধি প্রবেশ করিতে পারে না, এবং প্রবেশ করিলেও তজ্জন্য কোনও চিকিৎসক ডাকা বা ঔষধ খাওয়ার প্রয়োজন হয় না ; কারণ দেহস্থিত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ প্রহরী মণ্ডলীর শক্তির নিকট পরাজিত হইয়া ব্যাধি আপনা হইতেই সরিয়া পরে। বন্য পশুপক্ষীর মধ্যে যে কোনও ডাক্তার বা বিশেষ কোনও

ঔষধাদির ব্যবহার প্রচলন নাই উহা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গলের কারণ। তাহাদের ব্যাধিও কদাচিৎ হয় এবং এরূপ হওয়ার একমাত্র কারণ হইতেছে যে তাহারা সর্ব্বদা মুক্ত বায়ুতে বিচরণ করে। নেপোলিয়ান বলিয়াছিলেন "Do not counteract the living principle : leave it to the liberty of defending itself : it will do better than any drugs."

শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে যে বায়ু যত অধিক চঞ্চল সে বায়ু তত অধিক জীবনীশক্তি প্রদায়ক ; এবং রুদ্ধ, নিশ্চল বায়ু জীবনীশক্তি দানে অনুপযুক্ত। আকাশের অবস্থা ভাল থাকিলে মাঠের মাঝখানে বা ছাদের উপর মুক্ত বায়ুতে শয়ন করা, বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের প্রকৃষ্ট উপায়। অবশ্য তাহা সম্ভবপর না হইলে গৃহের সমস্ত দরজা জানালা খুলিয়া যে-দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে ঠিক সেই দিকের কোনও উন্মুক্ত জানালার নিকট মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক শয়ন করা কর্ত্তব্য। এস্থলে ড্রাইডেনের (Dryden) একটি কবিতা মনে পড়িতেছে ঃ—"Better to hunt in fields for health unbought,

Than fee the doctor for his noxious draught."

কএক বৎসর পূর্ব্বে এক ফাল্গুন মাসে যে দিন দীর্ঘজীবনলাভের পূর্ব্বোক্তরূপ সহজ উপায়টা জানিতে পারিলাম সেই দিন হইতেই ছাদে শয়ন আরম্ভ করিলাম। অসংখ্য তারকারাজিখচিত, নীলচন্দ্রাতপতলে, শুভ্রজ্যোৎস্নাপ্লাবিত ছাদে শয়ন করিয়া বিরহিজন-হৃদয়দহনকারী, অদূরস্থিত নর্দ্দমার গন্ধবাহী দক্ষিণা মলয় কএকদিন মাত্র উপভোগ করার পরই হস্তপদের সন্ধি সমূহের তীব্রবেদনাসহ বাতাক্রান্ত হইয়া পঙ্গু অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম। বাধ্য হইয়া কবিরাজ ডাকিতে হইল। কবিরাজ মহাশয় শুভাগমন করিয়াই প্রথমে "বসন্তে শিশির গ্রহণে"র অপকারিতা সম্বন্ধে ত্রিকালজ্ঞ, পঞ্চকালজ্ঞ, সপ্তকালজ্ঞ, প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ কে কি বলিয়াছেন তৎসম্বন্ধে কয়েকটি শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। তৎপর এমন কতকগুলা 'বড়ি' নামক গোলাকার পদার্থ প্রদান করিয়া গেলেন যে উহাদের এক একটিকে প্রস্তরোপরি ঘর্ষণ করিয়া মধুসহ লেহ্যোপযোগী অবস্থায় আনয়ন করিতে অন্ততঃ তিন ঘণ্টা সময় লাগিত।

পূর্ব্বোক্ত অভিজ্ঞতার পর ছাদে শয়ন পরিত্যাগ করিয়াছি। বর্ত্তমানে গৃহের সমস্ত জানালা কপাট খুলিয়া রাখিয়া যে স্থানে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক শয়ন করি, ঠিক তাহার পূর্ব্বে একটি ও দক্ষিণে একটি বৃহৎ জানালা আছে। বলা বাহুল্য বারমাসই জানালাদ্বয় খোলা থাকে, এবং জানালার মধ্য দিয়া বর্ষাকালে অজস্র বৃষ্টি আমার মস্তকোপরি বর্ষিত, এবং শীতকালে বহু শিশির আমার দেহের পূর্ব্বোক্ত অংশটার উপর সঞ্চিত হইয়া থাকে। মশারী ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছি ; পাছে বহিরাগত মুক্ত ও বিশুদ্ধ বায়ু গবাক্ষপথে গৃহাভ্যন্তরে আসিয়াও মশারী দ্বারা প্রতিরোধিত হইয়া আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিতে

না পারে। মানব জাতির প্রতি ঢাকার মশক সম্প্রদায়ের ব্যবহারটা (বিশেষতঃ রাত্রিকালে) যে সর্ব্বপ্রকার শিষ্টাচারবিরুদ্ধ তৎসম্বন্ধে বোধ হয় ভুক্তভোগিবর্গের মধ্যে কোনওরূপ মতদ্বৈধ নাই।

পূর্ব্ববর্ণিতরূপ আদর্শ প্রণালীতে মুক্ত-বায়ু সেবন হেতু আমার জীবনটা দৈর্ঘ্যে বা প্রস্থে বাড়িয়াছে কিনা তাহা বলিতে না পারিলেও, গৃহী হইয়াও গৃহহীনের ন্যায় পড়িয়া অবিচ্ছিন্ন, মশকদংশনে, বিনিদ্র দীর্ঘ রজনী অতিবাহিত করার অভিজ্ঞতা যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অর্জ্জন করিয়াছি তাহা উচ্চকণ্ঠে বলিতে পারি।

(৪)

আমাদের দেহটা অসংখ্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি দ্বারা গঠিত একটি জটিল যন্ত্র বিশেষ। বৈজ্ঞানিকগণের মতে মানবদেহে এমন কতকগুলা অংশ আছে যাহার কোনও প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না। এতদ্ব্যতীত ২।১ টা অংশ এমন ভাবে গঠিত যে উহাদের সহিত অপরাপর অংশের ঐক্য হয় না, এবং এই অনৈক্য হেতুই আমরা নানাপ্রকার কষ্ট ভোগ করি। "We suffer very much from *Disharmonies i. e.* imperfect adaptations of structures within us to the performance of the body as a whole."

দেহের অন্যান্য অংশের তুলনায় আমাদের বৃহদন্ত্রটা (Large Intestine) অত্যন্ত বৃহৎ; অর্থাৎ দেহ যন্ত্রটা সুপরিচালনার জন্য বৃহদন্ত্রটা অনেক ছোট হইলেও চলিত। অধ্যাপক মেষ্‌নিকফের (Metchnikoff) মতে বৃহদন্ত্রটা প্রয়োজনাতিরিক্ত বৃহৎ হওয়াতেই আমাদের দেহে বার্দ্ধক্য আসিয়া থাকে। বৃহদন্ত্রটা আয়তনে বৃহৎ হওয়ার ফলে অর্দ্ধপক্ক খাদ্যদ্রব্যের কতকাংশ তন্মধ্যে থাকিয়া যাইতে সুবিধা পায়। এই পদার্থগুলি অন্ত্রাশয় মধ্যে সন্ধিত (fermented) হইয়া এমন সকল রাসায়নিক পদার্থের উৎপত্তি করে যাহা মানব দেহে বিষক্রিয়া করিয়া থাকে। অন্ত্রমধ্যস্থ এক জাতীয় অনুদণ্ডক (bacteria) দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ অন্তরুৎসেক বা সন্ধান সাধিত হয়। বৃহদন্ত্রটা প্রয়োজনাতীত বৃহৎ না হইলে এরূপ কিছু ঘটিতে পারিত না।

বীজাণুতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের মতে ৪০ বৎসর বয়সের পর মনুষ্যের অন্ত্রমধ্যস্থ জীবাণু সমুহের সংখ্যা ও কার্য্যকরী ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; উহারা ভুক্তদ্রব্যস্থ পচনশীল প্রতিদ (Proteid) ভাগকে আক্রমণ করিয়া শীঘ্রই পরাক্রমশালী হইয়া পড়ে এবং শরীরে নানা প্রকার রোগের বিষ উৎপাদন করে। অধ্যাপক মেষ্‌নিকফের মতে উক্ত বিষদ্বারা জর্জ্জরিত হওয়াতে মানবদেহে বার্দ্ধক্যজনক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। উক্ত অধ্যাপক পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে পূর্ব্বোক্ত বার্দ্ধক্যআনয়নকারী জীবাণু সমুহের বৃদ্ধি ও কার্য্যকরী

পারে যে বাজার হইতে দুগ্ধাম্ল ক্রয় করিয়া নিয়মিত রূপে সেবন করিলে এই সকল দেহ-ধ্বংসকারী জীবাণুসমূহের আক্রমণ হইতে শরীর রক্ষা করা যাইতে পারে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, বিশুদ্ধ লেক্‌টিক্ এসিড্ সেবন করিলে তাহা অন্ত্র পর্য্যন্ত না পৌঁছিয়া পাকস্থলীর মধ্যেই রহিয়া যায় এবং কাজেই ঐ জীবাণু সমূহের উপর কোন ক্রিয়া করিতে পারে না। কিন্তু উক্ত জীবাণু সমূহের আবাসস্থানে যদি দুগ্ধাম্ল প্রস্তুত করান যায় তাহা হইলে উহা সহজেই উহাদিগকে নিষ্ক্রিয় রাখিতে পারে। অধ্যাপক মেষ্‌নিকফ্ দেখাইয়াছেন যে বিশুদ্ধ দধি ভোজন দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হয়। কারণ দধি ভোজন করিলে তন্মধ্যস্থ দুগ্ধাম্ল-বীজাণু সমূহও (lactic acid bacilli) তৎসহ অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ করিবে এবং ঐ স্থানে দধিস্থ অবশিষ্ট শর্করাভাগকে দুগ্ধাম্লে পরিণত করিবে। এই অম্ল অন্ত্র মধ্যস্থ দেহক্ষয়কারী জীবাণু সমূহের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া অকালবার্দ্ধক্য ও অন্যান্য বিবিধ প্রকারের রোগ হইতে শরীরকে রক্ষা করে।

বহু পরীক্ষাদ্বারা অধ্যাপক মেষ্‌নিকফ্ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রত্যহ দুগ্ধাম্লবীজাণু অন্ত্র-মধ্যে প্রবেশ করাইলে অর্থাৎ প্রতিদিন বিশুদ্ধ দধি ভোজন করিলে, মনুষ্য দীর্ঘজীবী হয় এবং ইন্দ্রিয় সকল সবল ও কার্য্যক্ষম থাকে। সমগ্র ইউরূপে বুলগেরিয়াতেই দধির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলন এবং এই দেশের অধিবাসিগণ অন্যান্য খাদ্যের সঙ্গে নিয়মিত ভাবে প্রতিদিন অল্পাধিক মাত্রায় "টক্‌দুগ্ধ" (বা দধি) পান করিয়া থাকে। সমগ্র বুলগেরিয়ার লোক সংখ্যা ত্রিশ লক্ষ। তন্মধ্যে ১০ জনের বয়স ১২৫ এর অধিক, ৮৮ জনের বয়স ১২০ হইতে ১২৫ এর মধ্যে এবং ২৩৪০ জনের বয়স ১১০ এর উপর। পৃথিবীতে বুলগেরিয়া সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী মনুষ্যের দেশ। বৈজ্ঞানিকগণের মতে ঐ দেশের লোকেরা প্রত্যহ দধিভোজন করে বলিয়াই এত দীর্ঘজীবী হয়।

দধিস্থিত কেসিন (casein) ভাগ জমাট অবস্থায় থাকা হেতু অনেক সময় আমাদের পক্ষে বিশেষতঃ রোগীদের পক্ষে উহা পরিপাক করা সহজ নয়। এমতস্থলে দধির পরিবর্ত্তে ঘোল বা মাঠা ব্যবহার করা শ্রেয়ঃ। ঘোলেও দধি বীজাণু থাকে।

দই মাঠা খাইলেই যে দীর্ঘজীবন লাভ করা যায় এই আবিষ্কারের সংবাদ জানার পরই 'মাঠাশী' হইয়া পড়িলাম। ....

প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত বড় হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়নাগারে বসিয়া ছয় মাস পর্য্যন্ত প্রতিদিন সার্দ্ধ দুই সের ঘোলের সরবৎ দেহাভ্যান্তরে প্রেরণ এবং তাহার অনুবর্ত্তী পরিণামের বিবরণ দেওয়ার সুযোগ হইল না। উক্ত কারণেই বৈজ্ঞানিক-গণকর্ত্তৃক দীর্ঘজীবন লাভের আরও যে সকল উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাদের আলোচনায়ও বিরত হওয়া গেল।

ইহা ছাড়া দীর্ঘজীবন লাভের আশায় আরও যে কত নিয়ম পালন করিতে চেষ্টা করিয়াছি

সে সকল ব্যক্তিগত ইতিহাসের বিবরণ প্রদান করিয়া প্রবন্ধের কলেবর আর বৃদ্ধি করিতে চাহি না। দুইটি বিষয় মাত্র উল্লেখ করা গেল।

কতকদিন পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিক-সংবাদপত্রসমুহে প্রকাশিত হয় যে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে হাইম্ খাওয়া বা তোলা অর্থাৎ জৃম্ভন করাই হইতেছে যৌবনময় দীর্ঘজীবন লাভের একমাত্র উপায়। উক্ত ক্রিয়ায় দেহমধ্যস্থ বিষাক্ত বায়বীয় পদার্থনিচয় বহির্গত হইয়া যায় এবং দেহের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রসমুহকে নবীনতা প্রদান করে। অবশ্য মনে করিলেই হাইম আসেনা অর্থাৎ জৃম্ভন করা যায় না, উহা অভ্যাস-সাপেক্ষ। চেষ্টা করিয়া ক্রমে ক্রমে অভ্যস্থ হইতে হয়। চিরঞ্জীবত্ব প্রাপ্তির এই সহজ প্রণালীটা জ্ঞাত হওয়ার পর প্রতিদিন প্রাতে নিয়মিতভাবে জৃম্ভন-সাধন আরম্ভ করিলাম। কয়েকদিন পর লক্ষ্য করিলাম যে আমি যখন আমার সমস্ত চেষ্টা কেন্দ্রীভূত, ও মুখ ও গলদেশের শীরা-উপশীরা সমুহকে যথাসাধ্য দৃঢ় ও সঙ্কুচিত করিয়া আকর্ণ-বিস্তৃত মুখব্যাদনপূর্ব্বক হাই তুলিবার প্রয়াস পাইতে থাকিতাম, আমার পঞ্চম বর্ষীয়া কন্যাটি প্রতিদিনই নীরবে আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একাগ্রচিত্তে ও সোৎসুক দৃষ্টিতে আমার মুখের ভিতরের দিকে উঁকি দিয়া থাকিত। কৌতূহলপরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে আমি যেরূপ ভাবে প্রকাণ্ড হা করিলাম, সেমতাবস্থায় মুখের ভিতর দিয়া উঁকি দিলে আমার পেটের নাড়িভুঁড়িগুলা দেখা যায় কিনা তাহাই সে পরীক্ষা করিত। কোথায় আমি একনিষ্ঠ-সাধকের মত একটা মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া কঠোর সাধনায় ব্যাপৃত, আর এই বিজ্ঞানানভিজ্ঞা পঞ্চমবর্ষীয় বালিকা কি না তাহার বাবার পেটের নাড়িভুঁড়ি দেখিবার জন্য ব্যগ্র। বলা বাহুল্য শ্রীমতীকে পূর্ব্বোক্তরূপ হঠকাঙ্খিতা বা দুরাকাঙ্ক্ষার পরিণামটা প্রত্যয় করাইয়া দেওয়ার জন্য তাহার গণ্ডদেশে যে কাবুলী ধরণের একখানা চপট সংস্থাপন করিয়াছিলাম তাহার ফলে সেই বরং এমন একটা হা করিয়াছিল যে তখন উঁকি দিলে বোধ হয় তাহারই পেটের নাড়িভুঁড়ি দেখা যাইত।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কুলগুরুদেব একবার আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, প্রভৃতি নানাবিধ ঞিক্ প্রত্যয়ান্ত তত্বালোচনা-প্রসঙ্গে গুরুদেব বলিয়াছিলেন যে সর্ব্বরোগহর নামামৃতরস পান করাই হইতেছে সর্ব্বব্যাধি ও জরামুক্তির একমাত্র উপায়। শুনিয়াছিলাম গুরুদেব কিঞ্চিৎ কবিরাজি জানিতেন এবং ২।৪ পদ ঔষধও সঙ্গে রাখিতেন। কিন্তু কবিরাজি ঔষধই যদি খাইতে হয় তাহা হইলে হাতুড়ে গ্রাম্য কবিরাজের ঔষধ না খাইয়া কোনও বড় কবিরাজের আশ্রয় গ্রহণ করাই সমীচীন মনে করিয়া গুরুদেবকে তখন আর ঐ ঔষধ সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া গোপনে নামটা লিখিয়া রাখিলাম। ঢাকাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই কলিকাতার কোনও বিখ্যাত কবিরাজের নিকট অর্দ্ধসের "নামামৃতরসে"র জন্য লিখিয়া পাঠাইলাম। পত্রান্তরে কবিরাজ মহাশয় জানাইলেন যে আমি বোধ হয় [illegible]

নামটা ভুল লিখিয়াছি, কারণ নামামৃতরস নামক কোনও ঔষধ আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্রে নাই। চরণামৃতরস আছে; উহা সূতিকারোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ; আদেশ পাইলেই পাঠাইয়া দিব। আমি যে ঔষধের নামটা ভুল করি নাই, এবং আমি কি জন্য ও কি প্রকার ঔষধ চাই তাহা বিস্তৃত ভাবে লিখিয়া পাঠাইলে কবিরাজ মহাশয়ের কোনও কর্ম্মচারী বা শিষ্যের নিকট হইতে যে উত্তর পাইলাম তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে,—আমি যে ঔষধের কথা লিখিয়াছি উহা প্রস্তুত করা এত কষ্ট ও ব্যয়সাধ্য যে কেহই তাহা স্বীকার করিতে সাহসী হয় না। কাজেই উহার ব্যবহার সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে। প্রাচীনকালে দেবতা ও ঋষিগণ এই অমৃতরূপ ঔষধ পান করিয়াই অমর হইতেন। ··· ··· বেদোক্ত স্কন্দনাভ (scandanavia ?) পল্লীস্থান (Palastine ?) মদভাস্কর (Madagascar ?) প্রভৃতি দেশ হইতে সংগৃহীত হীরণ্যক্ষীর ব্রহ্ম-সুবর্চলা, আদিত্যপর্ণী, সূর্য্যকান্তা, কষ্টলোধা প্রমুখ দুর্লভ বনস্পতি সমূহের রসের সহিত, আমোদরা (Amu Darya) অংশুকায়া (yansekiang) প্রভৃতি পুরাণোক্ত সপ্ত পূত নদীর নাতিশীতোষ্ণ বারি মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা শাস্ত্রোক্ত গারুত্মত, বিদ্রুম, গোমেদ, বৈদূর্য্য প্রভৃতি নবরত্ন ভস্ম একোনসহস্রবার ভাবনা ইত্যাদি ইত্যাদি করিয়া এই মহৌষধি প্রস্তুত করিতে হয়। সম্প্রতি তীব্বতদেশীয়া জনৈকা রাজকুমারীর জন্য একাদশবর্ষ অক্লান্তপরিশ্রমের পর এই ঔষধ প্রস্তুত করা হইয়াছে। আমার আগ্রহাতিশয় হেতু কবিরাজ মহাশয় অর্দ্ধ ছটাক ঔষধ নামমাত্র মূল্য একশত টাকায় দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। কয়েকদিনপর একশত টাকা দশআনা প্রদান করিয়া ডাকঘর হইতে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারী বা শিষ্যকর্তৃক প্রেরিত পুলিন্দাটি লইয়া যখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম তখন আমার কি অব্যক্ত আনন্দ? তাড়াতাড়ি পুলিন্দাটি খুলিয়া ব্যবস্থাপত্র অর্থাৎ ঔষধ ব্যবহারের প্রণালীটা পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াই যখন দেখিলাম যে ঐ ঔষধ প্রতিদিন প্রাতে ও সায়াহ্নে মস্তকে মর্দ্দন করিতে হইবে এবং পান করিলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু অবধারিত, তখন কি যে একটা ক্রোধের আবির্ভাব হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। ক্রোধের মাত্রাটা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হওয়ারপর জনৈক কবিরাজ বন্ধুকে শিশিটি দেখাইলে তিনি খুব ভাল করিয়া পরীক্ষান্তর আমাকে জানাইলেন যে ঐ শিশিমধ্যস্থ ঔষধটির নাম "হিমসাগর তৈল"। উহা মস্তিষ্কবিকৃতির শ্রেষ্ঠ ঔষধ; যাহাদের মাথা খারাপ হইয়াছে, এমন কি যাহাদের পূর্ণ উন্মাদাবস্থা তাহারাও এই তৈল ব্যবহারে অত্যল্পকাল মধ্যে সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাহাদের স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরিয়া আসে।

শিশিমধ্যস্থ ঔষধটির রহস্য প্রকাশ না করিয়া উহা কবিরাজবন্ধুটিকে দানপূর্ব্বক গম্ভীর-ভাবে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

কি করিলে বিশেষতঃ খাদ্য সম্বন্ধে কি নিয়ম পালন করিলে যৌবনময় দীর্ঘজীবন লাভ করা যায় তৎসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণের কয়েকটি নির্দ্দেশ সংক্ষেপে বিবৃত হইল, এবং এ সকল

নির্দ্দেশানুযায়ী কাজ করিয়া কিরূপ ফল পাইয়াছি তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করা গেল। দীর্ঘজীবী হইতে হইলে কি করা উচিত নয় এবং কি খাওয়া উচিত নয় তৎসম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত ছাপার অক্ষরে যে সকল ব্যবস্থা বাহির হইয়াছে তাহার কোনও আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

বৈজ্ঞানিকগণের মতে খাদ্যনির্ব্বাচনের উপরেই আমাদের জীবনের পরিমাণ নির্ভর করিতেছে।

বৈজ্ঞানিকগণের আদেশ পালন করিতে গিয়া আমার কি অবস্থা হইয়াছে তাহা আপনাদের নিকট অকপটে বিবৃত করিয়াছি। উপসংহারে আমার নিবেদন যে, আপনারাই বলুন কিছু বেশী দিন বাঁচিয়া থাকিতে হইলে এখন হইতে আমি কি খাইব ?

ভোরের শিশির

(শ্রীমনোমোহন রায়)

শিশির দল
শুভ্র উজল
হাসে খল্ খল্
প্রভাত বেলায়,
হাসে লতায় পাতায়
ধরণীর গায়। ১

শ্যাম দুর্ব্বাদল
স্নিগ্ধ মখমল—
শিশির সকল
মুকুতার মালা
রবির কিরণ ঢালা
ভুবন আলা। ২

শিশির দল
এ কি— কেবল
এক ফোঁটা জল
টল্ মল্ করে
ঘাসের ডগার 'পরে
পড়ে বুঝি ঝরে। ৫

শিশির দল
ঘাসের অশ্রুজল,
সরস কোমল—
নিশীথ রাতে ঝরা
কাঁর স্মৃতি ভরা
পাগল করা। ৬

দোদুল দোলে
লতিকার কোলে
ফলে ফুলে
কোরকের দুল,
ফোটা গোলাপ ফুল
তার কাণের দুল। ৩

যুবতি মনের ভুল
রাতুল তুল
শিশির ফুল। ৪

শিশির দল
চঞ্চল চপল
চোখের জল
কাঁর তরে হায়
ধরণীর আঁখির পাতায়
বসন তিতায়। ৭

বিরহনী আকুল
তুলে প্রেম ফুল,
শিশির কুল। ৮

আসার আশায়

(শ্রীরথীন্দ্র কুমার গুহ রায়)

ওগো সে এলো কই? প্রতীক্ষায় যুগযুগান্ত চ'লে গেল, সে কোথায়? মধু-যামিনী-প্রভাতে উষার কোলে ঢ'লে পড়ে তরুণ সূর্য্য, আকাশে রক্তরশ্মি ছড়িয়ে দেয়, তরুণ আমার বক্ষে স্পন্দন ওঠে—ঐ রাঙা আলোর সাথে সে আস্‌বে .... রাঙা আলো সাদা হয়ে আকাশ ভুবন ছেয়ে ফেলে, সবুজ ঘাসের ওপর সাদা শিশিরবিন্দু আর চিক্‌মিক্ করে ওঠেনা, আমার বুকের স্পন্দন থেমে যায়—তৃষিত আমায় জুড়াতে, আমার বাঞ্ছিত তো এলোনা!

*   *   *   *   *   *   *

তারি পথ চেয়ে, তারি দরশন যেচে আমি বসে আছি। সায়াহ্নে গগনের নীলিমা রঞ্জিত হয়ে গেল — এযে তারি পদপরশে। দখিন্ হতে আম্রমুকুল গন্ধে-উদাস বাতাস এলো — তারি আগমনের বার্ত্তা নিয়ে। আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে গেলুম্ — সে কি তবে এলো?, নীলবাসে তনু ঢেকে মালাগেঁথে বিজন আলয়ে প্রদীপ জ্বেলে আমি বসে থাকি। দূরে কোন্ উদাসী দিনান্ত বেলায় অলস বাঁশী বাজায়, তার সুর ভেসে আসে। সান্ধ্য আকাশের ম্লানিমা গাঢ় হয়ে যায়,

বাঁশীর সুর কেঁদে ফিরে থেমে যায়, ধীরে একটি দু'টি ক'রে তারা নীল আকাশে ঝিলিমিলি করে — সে তো আর আসেনা!

....

আমার বিজন ঘরের বাতি নিভে যায়, উচ্ছ্বসিত স্রোতে মুক্ত দ্বারে বাতায়ন পথে চকিতে কক্ষে বক্ষে চক্ষে এসে পড়ে—ত্রিভুবন বিপ্লাবিনী মৌন সুধাহাসি। ঘরের বা'র হয়ে দেখি, অভিসারিকার বেশে আকাশের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে সুররাণী, নীল গগণের অসীম ছেয়ে গেছে তার হাসিতে। তরুমর্ম্মর নদীকলতান, কানে স্বপন-সমান লাগে। বুঝি বা সে এলো, তাকে বুকে নিয়ে আমিও মিশে যাবো অসীমে চাঁদের আলোর সাথে সাথে......আলো যে ম্লান হয়ে গেল—সে কি এলো না? আমি কি দেখ্‌ছিলুম্? আমার সারা-রজনীর গাঁথা ফুল-মালা ঝ'রে পড়্‌লো, সে তো আর এলো না!

* * * * * * *

ওগো সে কি করে ভুলে আছে — 'এতো প্রেম আশা, প্রাণের তিয়াষা'? সে তো নিঠুর নয়। সেথা কি 'চাঁদিনী যামিনী' হাসে না, সেথা কি বাঁশরী বাজে না, সমীরণ কি সেথা ফুলবন লুটে না? পূর্ণিমার মধুনিশি বার বার ফিরে আসে, 'যে জন চ'লে গেছে, সে তো আর ফিরে না'।

* * * * * * *

সে তো আর এলোনা গো। দখিনের 'দোলা-লাগা' পাখী-জাগা বসন্ত প্রভাত এসেছে, গন্ধ-ব্যাকুল বাতাসে ফুল দুল্‌ছে, মর্ম্মর-মুখরিত নবপল্লব পুলকিত ফুল-আকুল মালতী-বল্লি-বিতানে তার অপেক্ষায় বসে আছি .... কত যে বরণ, কত গন্ধ, কত রাগিনী কত ছন্দ গেঁথে তার শয়ন রচেছি, সে কি আস্‌বে না?

.... আমি থাক্‌বো কি করে? গ্রীষ্মের দুপুরের হেলাফেলায় তারি কথা যে মনে পড়্‌বে। বর্ষার বাদল দিনে সাঁঝের মেঘে যে মনে পড়্‌বে তারি আঁখি — করুণ, কোমল, কালো; আষাঢ়ের ঝরা-মেঘে বেজে ওঠ্‌বে তারি স্বর, শ্রাবণের ঝিল্লি-মন্দ্র সঘন-সন্ধ্যা তার অভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবে। ভরা ভাদরে কুলে কুলে নদীভরা, ক্ষেতে ভরা ধান, কদম্ব গাছের চিকণ পল্লবে গন্ধে ভরা অন্ধকার কাণায় কাণায় আমার পরাণ পূর্ণ করে দেবে .... সে কি তখন আস্‌বে না? বরষার কাজরী গাঁথায় ডালে ডালে পাতায় পাতায় ঝুলনের দোলা লাগে, বর্ষে বর্ষে এ দোলায় বিদ্যুৎ-নাচন গানে তার বাণী যে তাল দিত—আজ সে কোথায়?

শরৎপ্রভাতে শিউলি তলায় ছড়ানো ফুলের পাশে মনে পড়্‌বে তারি কথা! প্রতি বর্ষে শিউলি-ঝরা জ্যোছ্‌না-রাতে শুভ্র শেফালি-মাল্যে তার অর্চ্চনা হোত, তার উদ্দেশে শিশির সিঞ্চিত পুষ্পদল আজ ঝরে পড়্‌লো—সে কোথায়? সাদা মেঘ সঙ্গে নিয়ে শারদ-লক্ষ্মী বিশ্বের প্রাণে উৎসবের সুরের রেশ তু'লে দেবেন—আমার মন তো মাত্‌বে না,

তার সন্ধানে যে ঘুরে মর্‌বো। হেমন্তের কুহেলি-গুণ্ঠনতল, শীতের কুজ্ঝটি-সায়হ্ন আমার কি সবই ব্যর্থ হবে? আমি কি ক'রে থাক্‌বো।

* * * * * * * *

কত আর মর্‌বো; পথপানে চেয়ে চেয়ে আর কত থাক্‌বো। কবে সে আস্‌বে? 'মেঘ-গরজনে বর্ষা আস্‌বে মদির নয়নে বসন্ত হাস্‌বে'......সে কি আস্‌বেনা? যেদিন আবার মুকুল ফুট্‌বে, সেদিন কি তাকে দেখ্‌তে পাবো না? ব্যাকুল ফাগুন-হাওয়া বইলে, সে কোন্ হিসাবে দূরে থাক্‌বে? সঙ্গহারা আমি, আমার ফুলের মেলা ভেঙ্গেছে, হাসি-খেলা চলে গেছে, প্রকৃতির সাথে সাথে মন আর নৃত্য-দোদুল ছন্দে নেচে উঠেনা, মাতাল বাদল রাতে মনে আর মাদল বেজে ওঠেনা......বিশ্বের সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর আলোর ঝল্‌মলানি চোখে আর ভালো লাগেনা······সূর্য্যাস্তপারের স্বর্ণরেখার ইঙ্গিতে প্রাণ তার অজানাপথে চলে গেছে,—অশ্রু মাখানো আঁখি দুটি আর জীর্ণ দেহখানা পড়ে আছে শুধু—তারি আসার আশায়।

দাক্ষিণাত্যে দিনত্রয়

(শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ; বি, এল,)

বিড়ালের ভাগ্যে হঠাৎ শিকা ছিড়িল, আমারও মান্দ্রাজে প্রাচ্য-বিদ্যা-সম্মেলনে (oriental conference) যাওয়ার সুবিধা ঘটিল। মনে ভাবিলাম, এত দূরই যখন যাইব, তখন আর কিছু দূর অগ্রসর হইয়া একেবারে রাম যেখানে সমুদ্রের উপর সেতু নির্ম্মাণ করিয়া লঙ্কায় গিয়াছিলেন, সেস্থানটাও দেখিয়া আসিব। ভারতবর্ষের, বলিতে গেলে, একেবারে শেষ সীমা দেখিবার কাহার না সাধ যায়?

এই সব সংকল্প এবং আকাঙ্ক্ষা নিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। যে পর্য্যন্ত বাংলাদেশে ছিলাম, সে পর্য্যন্ত যে সকল বিস্তীর্ণ শস্যশ্যামল প্রান্তর, এবং দুই ধারে যে সকল রম্য গ্রাম সমূহ দেখিয়াছি, তাহার ভিতর কোন নূতনত্ব দেখি নাই, সুতরাং বলিবারও কিছু নাই। শেষ রাত্রে যখন চিল্কা হ্রদের পাশ দিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল—তখনই, অদূরে বিরাট জলরাশি দেখিয়াই মনে হইল যে, এক নূতন দেশে আসিয়া পড়িয়াছি। পরে, ক্রমশঃ দুই ধারে পাহাড়ের শ্রেণী, শুষ্ক শস্যহীন মাঠ, এবং নিষ্প্রভ দারিদ্র্য-চিহ্নিত গ্রামগুলি দেখিয়া স্পষ্টই মনে হইতে

লাগিল, বাংলাদেশের মত অমন সবুজ মাঠ এবং অমন সুন্দর গ্রাম পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পাওয়া যায় না।

অন্ধ্রদেশে প্রবেশ করিতে না করিতেই ক্রমশঃ দুই একজন অন্ধ্রের সঙ্গে গাড়ীতেই সাক্ষাৎ লাভ ঘটিতে লাগিল। সে সব লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া সে জাতির সম্বন্ধে মনে যে ধারণা জন্মিল, তাহা খুবই অনুকূল নহে। গায়ে পড়িয়া আলাপ করার অভ্যাসটা ওদের আমাদের চেয়েও বেশী। বাংলাদেশে পথ চলিতে গেলে কতকগুলি প্রশ্নের জবাব মুখে করিয়া বাহির হইতে হয়, যথা—'মশা'য়ের নাম? কোথা হ'তে আসা হচ্ছে? কোথায় যাওয়া হবে?—ইত্যাদি'; তারপর, আলাপটা একটু ঘনাইয়া উঠিলে 'মশা'য়ের মায়না কত, এবং 'উপরি কি পান,' প্রভৃতি প্রশ্নের জবাবও যে না দিতে হয় এমন নয়। কিন্তু বর্ত্তমানে ইংরেজী আদব কায়দার দৌলতে এসব অনেকটা কমিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সত্যি কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, যে, এরূপ প্রশ্নকর্ত্তাকে অনেক সময়ই একটা অসহ্য উপদ্রব বলিয়া মনে হয়। রাস্তায় চলিতে গিয়া ত মানুষ সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠে না, যে, তাহাকে অনবরত জেরার উত্তর দিতে হইবে!

বাংলাদেশ হইতে যে উপদ্রবটা কতক দূরীভূত হইয়াছে, মনে হয়, তাহা অন্ধ্রে গিয়া আশ্রয় পাইয়াছে। তবে অন্ধ্রদের পক্ষে বলিবার এইটুকু আছে, যে, তাহারা বাঙ্গালীকে মান্য করে এবং সেই জন্যই, রাজনৈতিক ব্যাপারে অন্ততঃ, বাঙ্গালীর অনুকরণও করিয়া থাকে; এবং অনুকরণে যে অকৃতকার্য্য হয় নাই, এইটুকু বুঝাইবার জন্যই হয় ত, সে তাহার নিজের কথাই বেশী বকিয়া যায়, সঙ্গীকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া বিব্রত করিয়া তুলে না। সুতরাং অতি অল্প সময়ের জন্যও যাঁহার সঙ্গে আলাপ হইল, তিনিও যাবার সময় তাঁহার একখানা 'কার্ড'আমার হাতে দিয়া গেলেন, এবং তিনি যে ভিজিয়ানগরম্-এ ওকালতি করেন, তাহাও জানাইয়া গেলেন।

একজন উকীলের সঙ্গে আলাপ হইল; তিনি যুক্তপ্রদেশের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী চিন্তামণির বাল্যবন্ধু বলিয়া নিজকে পরিচিত করিলেন; যে বাল্যবন্ধু বড় হইয়াছে, তাহার শক্তিমত্তার প্রশংসা না করিয়া উপায় নাই; আমাদের উকীলটীও তাহা করিয়াছিলেন। কিন্তু বাল্যবন্ধুর অনন্য-সুলভ অধিকারের জোরে তিনি চিন্তামণির কিছু কিছু কুৎসাও প্রচার করিলেন।

বিজ্ঞাপন-স্পৃহাটা ইহাদের বোধ হয় আমাদের চেয়েও বেশী। নিজের বিদ্যাবত্তা দেখাইবার জন্য ফর্ ফর্ করিয়া দুটা চারটা সংস্কৃত শ্লোক প্রায় সকলেই আওড়াইয়া যায়; কিন্তু কুৎসা করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও একথা না বলিয়া পারিতেছি না, যে, সে বিদ্যার দৌড়টা খুব বেশী দূর নয়। পণ্ডিত অবশ্যই সে দেশেও যথেষ্ট রহিয়াছেন; কিন্তু বিশিষ্ট, বিচক্ষণ এবং অসাধারণ ব্যক্তিদের দ্বারা সর্ব্বসাধারণের বিচার করা চলে না; সাধারণ শিক্ষিতদের মধ্যে লোক-দেখানো আড়ম্বরটা কিছু বেশী বলিয়াই মনে হইল।

অন্ধ্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে ধনুষ্কোটী এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে মহীশূর পর্য্যন্ত

বিস্তীর্ণ প্রদেশে যাতায়াতে প্রায় চারি হাজার মাইল গাড়ীতে ভ্রমণ করিয়াছি। এই দীর্ঘ ভ্রমণের মধ্যে খাদ্য এবং পোষাকের যে কয়েকটী নূতনত্ব আমার চোখে ঠেকিয়াছে, তাহার মধ্যে দাক্ষিণাত্য-বাসীদের অদ্ভুত সাহেবিয়ানাটাই আমাকে বেশী চমকিত করিয়াছে। এঁরা এমনি ভয়ানক গোঁড়া; ব্রাহ্মণের আহার অব্রাহ্মণ দেখিতে পারে না; ব্রাহ্মণের বাড়ীতে ভিতরের কাজের জন্য অব্রাহ্মণ ভৃত্য পর্য্যন্ত রাখা হয় না। কিন্তু সাহেবদের মত বুক-চেরা কোট এবং গলাবন্ধ, এই দুইটী তাঁদের ভদ্র পোষাকের অঙ্গ। জুতা সকলে পায়ে দেয় না; যারা দেয়, তারাও সব সময় সেটাকে আবশ্যক মনে করে না। কিন্তু ঐ সাহেবী কোট-টী না হইলেই নয়। খালি পা, মালকোচা দেওয়া কাপড়, মাথায় পাগড়ি এবং সর্ব্বোপরি গলায় গলাবন্ধ এবং পিঠের বুক-চেরা কোট; এই হইল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাধারণ পোষাক। অনেকে একেবারে সোলার টুপি ছাড়া আর সব রকমে ষোল আনা সাহেবি পোষাকও পরিধান করিয়া থাকেন; টুপির জায়গায় পাগড়ীটী সকলেই বজায় রাখিয়াছেন। যারা সাহেবী পোষাক গ্রহণ করেন নাই—এমন কি, পায়ে জুতা পর্য্যন্ত পরেন না, তাঁরা যে কি বলিয়া বুক-চেরা কোটের মহিমায় মুগ্ধ হইলেন, সেটাই আমি ভাবিয়া পাই নাই।

আমাকে একজন মান্দ্রাজী ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন, ও দেশে কোটের সম্মান বড় বেশী; কিন্তু তেমনই, অন্য প্রকার গাত্রাবরণের কোনই সম্মান নাই। আমরা কিন্তু ধুতি চাদর নিয়াও বাহির হইয়াছি এবং চোগাচাপকান নিয়াও গিয়াছি; অসম্মান আমাদের কেহই করে নাই—হইতে পারে, বিদেশী বলিয়া। খাদ্য সম্বন্ধে ছোঁয়াছানি ব্যারাম হিন্দুসমাজের মজ্জাগত, সুতরাং মদ্রদেশে তাহা থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। কিন্তু সেখানে গোঁড়ামির মাত্রাটা অভদ্রোচিত আকার ধারণ করে; এমন কি অতিথির মর্য্যাদা পর্য্যন্ত রক্ষা করে না। একজন মাদ্রাজী বন্ধুর অতিথি হইয়াছিলাম; আপ্যায়নের কোনই ত্রুটী হয় নাই। কিন্তু আহার করিতে বসিয়া যাহা দেখিলাম, পূর্ব্বঃহইতে এই পদ্ধতির কথা জানা না থাকিলে, দুর্ব্বাসার মত অভিশাপ দিয়া যে স্থান ত্যাগ করিতাম না, তাহা বলিতে পারি না। ভদ্রলোকটী নিজে খুবই গোঁড়া নন, কেননা, তিনি গোঁফ রাখিয়াছেন, যাহা ব্রাহ্মণদের মধ্যে সে দেশে কেহই প্রায় রাখে না। তিনি ইংরেজী শিক্ষিত লোক এবং থিওসফির ঝোঁকটীও বেশ প্রবল আছে। বাড়ীতে পাচক ব্রাহ্মণ রান্না করে। কিন্তু আহার পাত্রের শুচিতা সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান! নিজে এবং তাঁহার দুই পুত্র প্রত্যেকেই যার যার এক এক সেট বাসন-থালা বাটী ইত্যাদি—নিয়া বসিল; কিন্তু আমি এবং আমার আর একজন মান্দ্রাজী বন্ধু—অর্থাৎ যে দুই জন অভ্যাগত, তাদের ভাগ্যে জুটিল কয়েকটী গাছের পাতা, বাঁশের সরু খড়্কে দিয়া গাঁথিয়া থালার মত তৈরি করা। অতিথির এমন সমাদর অন্য কোন দেশে করে কি না জানি না। অথচ, ঐটীই সেই দেশে—ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিশেষতঃ, গৃহীত পদ্ধতি।

নিজেদের মধ্যেও পরিবারের এক জনের ব্যবহৃত বাসন-পত্র নাকি আর একজন ব্যবহার করে না; পিতা যে থালায় ভাত খান, পুত্র কিংবা স্ত্রী তাহাতে ভাত খাইতে পান না। দেখিলামও, প্রত্যেকেই নিজের ব্যবহারের বাসন কয়খানা নিয়া বসিলেন। শুচি থাকিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল বটে।

যে ভদ্রলোকের বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিলাম, তাঁহার পাচক ব্রাহ্মণই ভৃত্যেরও কাজ করিয়া থাকে। মাহিনাও সে প্রায় দুই জনের সমানই পায়। ২৫৷৩০, এমন কি ৪০ টাকা পর্য্যন্ত এরূপ একটী লোকের বেতন হয়, বলিয়া শুনিলাম।

খড়্গপুর পার হইয়া দক্ষিণে ধনুষ্কোটী পর্য্যন্ত এবং মাদ্রাজ হইতে পশ্চিমে মহীশূরপর্য্যন্ত, এই বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের মধ্যে কোথাও ছানার জিনিষ চোখে দেখি নাই। বাংলা দেশে যেমন প্রায় প্রত্যেক রেলওয়ে ষ্টেশনে ছানার মিষ্টি এবং কচুরি, নিমকি, লুচি, পাউরুটী প্রভৃতি বিবিধ খাদ্য সামগ্রী পাওয়া যায়, দাক্ষিণাত্যের জীবদের জন্য ভগবান্ তাহা অদৃষ্টে লিখেন নাই। খাবার প্রায় সব ষ্টেসনেই পাওয়া যায়; কিন্তু সে সেই একই ধরণের খাওয়ার। যাওয়ার পূর্ব্বে কাহারও কাহারও নিকট শুনিয়াছিলাম যে, কোন কোন বড় বড় ষ্টেসনে পুরী, ভাজি, তরকারী প্রভৃতি খাবার পাওয়া যায় এবং সেগুলি খুব ভাল। কিন্তু শ্রুতির প্রমাণে যাহা জানিয়াছিলাম, প্রত্যক্ষে তাহা টিকিল না। পুরী পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার উপাদান সবটা ময়দা নয়, অর্দ্ধেকই বোধ হয় চাউলের গুঁড়া; আর সেটা ঘৃত ভিন্ন অন্য যে কোন স্নেহ দ্রব্যে ভর্জ্জিত হইয়া থাকে। আর তরকারী যাহা পাওয়া যায়, তাহার বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন; কেন না, সে দেশে একাধিক ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি, যে, তাঁদের মধ্যে আলুটা একটা বিলাস দ্রব্য। সুতরাং ষ্টেশনের তরকারীর মধ্যে কয়েক কুচি গোল আলু, কয়েক টুকরা নারিকেল, এবং কয়েক খণ্ড আদা এবং পেঁয়াজ, বাকীটা, এলোপ্যাথি ওষুধে জল দেওয়ার মত লঙ্কার কুচি দিয়া পরিপূর্ণ করা। এই জিনিসটীই কিংবা ইহা হইতে দুএক পদ বাদ দিয়া — অবশ্যই লঙ্কাটী কখনই বাদ দিয়া নয়— মসল্লা ছাড়া সিদ্ধ করিলেই তাহার, ভাজা, আখ্যা হয়।

আর একটী অতি উপাদেয় জলখাবার বাড়ীতে অনেক মাদ্রাজী ভদ্রলোককেই ব্যবহার করিতে দেখিলাম; সেটীর উপাদান, মটর কিংবা বুটের ডাল, সম পরিমাণ লঙ্কার কুচি, আদার কুচি, নারিকেল খণ্ড এবং পেঁয়াজ, একত্র করিয়া ডালপুরির মতন ভাজা। ইহাকে সেদেশী ভাষায় একটী সরস নাম দেওয়া হইয়াছে— কিন্তু নামটী আর আমার এখন মনে হইতেছে না।

কেহ যেন মনে করেন না, দাক্ষিণাত্যে কেহ সুজি খায় না। সুজি দিয়া তারাও দিব্যি হালোয়া তৈয়ার-করে; যথা, সুজি, লবণ, লঙ্কার এবং আদার কুচি,—তদুপরি কিঞ্চিৎ মসল্লা, অর্থাৎ মৌরী, গুলমরিচ ইত্যাদি; একত্রে তিলের তেলে ভাজা; তৎপর, উপরে এক চিমটী দোবরা চিনি দিয়া কলার পাতে পুলিন্দা বাঁধিয়া বিক্রয়; সাধারণতঃ চার পয়সা করিয়া এক এক

পুলিন্দার দাম। খাইয়া দেখিয়াছি, জঠরে যখন বৈশ্বানর বিরাজমান থাকেন, তখন আদার কুচির সহিত লঙ্কা কেন, রাবণ-সহিত লঙ্কাও হজম করা যায়।

চাউলকে ওদেশের লোকে শুধু ভাত করিয়াই খায় না; উহাদের জলখাবার প্রায় সব জিনিসের মধ্যেই তণ্ডুলকণা কোন না কোন প্রকারে বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু তণ্ডুলের একটী জিনিস ওঁরা তৈয়ার করেন, যাহা অন্য দেশে পাওয়া দুষ্কর; উহার নাম 'ঈড্‌লি।' অনেকটা চিতই-পিঠার মত; কিন্তু গুড় চিনির গন্ধও নাই। শুধু চাউলের গুঁড়া, সিদ্ধ করা। উহা নাকি ভারি পুষ্টিকর; এবং ইহার গুণ ব্যাখানে অনেককেই সামগের মত তারকণ্ঠ অবলম্বন করিতে দেখিলাম। একাধিক ব্যক্তি আমাকে বুঝাইয়াছেন যে, ইহা সাধারণ ভাবে সিদ্ধ করা হয় না; ইহা বাষ্পে সিদ্ধ হয়, সুতরাং ইহার গুণের অন্ত নাই, ইত্যাদি। আগাগোড়া দেখিয়া গিয়াছি, কখনও খাইতে ভরসা পাই নাই। অবশেষে রামেশ্বরের পথে একদিন এক রাত্রি শুধু কলা এবং বিস্কুট খাইয়া কাটাইয়া দিয়া, পর দিন প্রাতে রামেশ্বরের মন্দিরের পার্শ্বে এক বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের দোকানে কাফি খাইতে গিয়া এই মহাদ্রব্য আস্বাদন করিয়া আসিয়াছি। ইহার অনুপান বেশ ঝাল এবং টক্ মিশ্রিত মুগের ডাইল। এই অদ্ভুত সামগ্রী সহযোগে প্রাতে এক গেলাস গরম কাফি খাইতে যে কেমন লাগে, তাহা শ্রীরামচন্দ্রই জানেন।

ফলের মধ্যে কলাটা মন্দ পাওয়া যায় না। আর, নারিকেল অবশ্যই আছে; কিন্তু সেটা ফল কি তরকারী, বলা কঠিন। নারিকেল দিয়া বাঙ্গালী কত রকম জল খাবার তৈয়ার করে; দাক্ষিণাত্যে দুই হাজার মাইলের মধ্যে সে সব জিনিষ ত একটীবারও আমার চোখে পড়িল না।

মাদুরাতে মীনাক্ষীর মন্দিরে বৈদ্যুতিক আলো ঢুকিয়াছে; কিন্তু বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের হোটেলে খাইতে বসিয়া এঁটো হাতে জলের গ্লাস ধরিয়া চুমুক দিয়া জল খাইয়াছিলাম বলিয়া সঙ্গের পথ-প্রদর্শক ইসারায় আমাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল। আর, পরিবেশক ঠাকুর মশা'য় পাতে দই দিয়া গেলেন, কিন্তু চিনি বলিয়া যে একটা পদার্থ আছে, সেটা একবার মনে করিতেও দিলেন না। কি করি, অবশেষে ছয় আনার পয়সা গুণিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িলাম।

রাম যেখানে সমুদ্রে সেতু বাঁধিয়া সীতাকে আনিতে লঙ্কায় গিয়াছিলেন, সেখান হইতে একখানা বাষ্পীয় পোত রোজই ডাক এবং আরোহী নিয়া লঙ্কা এবং ভারতের মধ্যে যাতায়াত করে। সকাল বেলায় সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম; জাহাজখানা প্রথমে একটা কালো বড় পাখীর মত আকাশ যেখানটায় সমুদ্রের কোলে মিশিয়া পড়িয়াছে, সেখানটায় দেখা যাইতেছিল; তারপর ক্রমশঃ তীরের নিকটবর্ত্তী হইতেছিল আর আকারে বড় হইতেছিল। দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছিলাম, এই পথেই না, দীর্ঘ বিরহের পর স্ত্রীকে

নিয়া রাম দেশে ফিরিয়াছিলেন ? আর, ভাবিতেছিলাম, না জানি ঐ জাহাজেও বা কোন রাম তাঁহার সীতাকে সঙ্গে নিয়া আসিতেছেন! কিন্তু জাহাজের যাত্রীরা আসিয়া একে একে আমাদের গাড়ীতে উঠিলেন; আসিলেন সব বেশীর ভাগই মুসলমান ব্যবসায়ী; লঙ্কার অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দেশে ফিরিতেছেন কিংবা ভারতের অর্থ লঙ্কায় নিবার পথ খুঁজিতে এ দেশে আসিতেছেন। কোন রাম-সীতার গন্ধও তাঁহাদের গায়ে পাওয়া গেল না।

রাম বলিয়াছিলেন—"তমাল-তালী-বনরাজি-নীলা আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশেঃ"।—লবণাম্বুরাশির বেলাভূমিতে তাল গাছ এখনও প্রচুর আছে; শুধু তাই নয়, তাল, সুপারী এবং খেজুরই সেদেশে প্রধান বনস্পতি। কিন্তু তমালগাছ চোখে পড়িয়াছে বলিয়া ত মনে হয় না। তথাপি ধনুষ্কোটী পিয়ার্ (Pier) এর উপর দাঁড়াইয়া তীরের দিকে চাহিলে যে একটী গাঢ় নীল রেখা অনুভূত হয়, তাহা কবির বর্ণনাকে সার্থক করিয়া দেয়।

দাক্ষিণাত্য মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। এই অসংখ্য মন্দিরসমূহের মধ্যে আমার ভাগ্যে অতি অল্পই দেখা হইয়াছে। কিন্তু মাদ্রাজ সহরে পার্থসারথির মন্দির হইতে আরম্ভ করিয়া রামেশ্বরের মন্দির পর্য্যন্ত যে কয়টা মন্দির আমি দেখিয়াছি, সবই একই ধরণে তৈরি, তবে, আকারে ছোট বড় অবশ্যই আছে। এই সব মন্দিরের একটু সাফাই এখানে না গাহিয়া পারি না; পুরীর মন্দিরের গায়ে যে সব বীভৎস মুর্ত্তি রহিয়াছে, দাক্ষিণাত্যে একটী স্থল ভিন্ন আর কোথায়ও সে সব আমার চোখে পড়ে নাই।

গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে মেষ, ছাগল এবং গরু মাঠে চড়িয়া খাইতে দেখিয়াছি, কিন্তু খুব যথেষ্ট দেখিয়াছি, বলিয়া মনে হইল না। আর মানুষদের পোষাক—যদিও চেহারা ঠিক নয়—যেমন এখান হইতে পৃথক্, তেমনি গরুগুলিও দেখিতে অনেকটা ভিন্ন রকমের। তাদের যখন পোষাকে তাফাৎ করিবার উপায় নাই, তখন, বিধাতা বাধ্য হইয়া তাদের শিং-জোড়া এবং কপালটা বাংলা দেশের গরু হইতে একটু ভিন্ন রকমে গড়িয়া দিয়াছেন। ইহার বর্ণনা আরম্ভ করিলে, কাহিনী নিতান্ত পাঠ্য-পুস্তকের আকার ধারণ করিবে; সুতরাং সেটা আর চেষ্টা করা গেল না।

দেশের দারিদ্র্যের পরিমাণ তাহার গ্রামের চেহারায়ই পরিলক্ষিত হয়। দাক্ষিণাত্যে গ্রাম বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, সেটী বড় চোখে পড়ে নাই। পাহাড়েরই তলায় কতকগুলি কুড়ে একত্র চালে চালে লাগিয়া রহিয়াছে, এ দৃশ্য অনেক দেখিয়াছি; কিন্তু একটীও তেমন সম্পন্ন বলিয়া মনে হয় নাই। মাটীর দেয়াল, তালপাতার ছাউনি, অতি নীচু—এত নীচু যে মাথা বাইরে রাখিয়া ভিতরে ঢুকিতে হয় — এই সেখানকার পল্লীগৃহ। হাওয়া চলিবার জন্য মাটীর দেয়ালের এক কোণে ইন্দুরের বড় গর্ত্তের মত একটী গর্ত্ত মাঝে ২ দূর হইতে মুখ ব্যাদান করিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। কিন্তু যে দেশে মলয়ানিলের জন্ম, সে দেশের মুক্ত হাওয়া তাহার ভিতর দিয়া যাতায়াত করিতে রাজী হয় কিনা, বলিতে পারি না।

অবশ্যই এই সব ঘরের প্যাঁচের মধ্যে এক স্থানে — রেলওয়ে যাত্রীর চোখের অন্তরালে — জলের কূয়া আছে ; এবং তাহা হইতে জল তোলা নিয়া ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণে দ্বন্দ্ব পাকিয়া উঠে।

এই সব গ্রাম সম্বন্ধে একজন মদ্র-দেশীয় সহযাত্রী বলিয়াছিলেন, যে, ইহারা বৎসরে একবার বহ্নি দ্বারা সংস্কৃত হইয়া যায় (have an annual purification by fire). ভদ্রলোকটীর রসজ্ঞানে আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আর, গ্রামগুলি যে বছরে একবার পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইতে পারে, তাহা একটুও অসম্ভব বলিয়া মনে হয় নাই।

অবশ্যই সম্পন্ন গৃহস্থ সে দেশে নাই একথা কেহ বলে না। কিন্তু রেলের দুধারে বাংলাদেশে যেমন বড় ঘর-ওয়ালা বাড়ী দেখা যায়, তেমন বাড়ী খুব বেশী চোখে পড়ে নাই। টীনের ঘর সে দেশের লোকে বোধ হয় বাঁধে না ; হয় দালান, না হয় তালপাতার কুঁড়ে—এ দুয়ের মাঝামাঝি আরও কত রকমের ঘর যে বাংলাদেশের বুকে রহিয়াছে, সেগুলির কোন নমুনা ত দাক্ষিণাত্যে চোখে পড়িল না।

দেশটা যে বাঙ্গলার চেয়ে দরিদ্র এবং অনেক বিষয়েই অনুন্নত, তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবে না। কিন্তু তিনটী বিষয়ে সে দেশের লোকের সুখ্যাতি না করিলে, নিমক-হারামী হয়। প্রথমতঃ, ঐ দেশের সহরবাসীরা, যে কারণেই হউক, ইংরেজীকে প্রায় মাতৃভাষার মত ব্যবহার করিতে পারে। সহরের কুলীমজুর, রিক্‌শ-ওয়ালা, ট্যাক্সি-ওয়ালা প্রভৃতি সকলের সঙ্গেই ইংরেজীই আমাদের ভাব-বিনিময়ের বাহন ছিল। রামেশ্বরে কেবল কতকগুলি হিন্দুস্থানী আস্তানা গাড়িয়া হিন্দীকে কথ্য ভাষার সামিল করিয়া রাখিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, ঐ দেশে সংস্কৃত শিক্ষার বহুল প্রচলনও আর একটী লক্ষ্য করিবার জিনিষ। পদস্থ সকল ব্যক্তিই প্রায় সংস্কৃতে জ্ঞানবান্। সেই জন্যেই হউক, কিংবা অন্য যে কারণেই হউক, ও দেশের ভদ্রলোকদের গলা-কাটা কোটের নেশাটা বাদ দিলে, পোষাকে ওঁরা অন্য প্রকারে বেশীর ভাগই খুব সাদাসিধা। মাদ্রাজ হাইকোর্টের সব চেয়ে বড় উকীলকেও দেখিয়াছি, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের আপ্যায়নের জন্য নগ্নপদে চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছেন। এমনটী বাংলাদেশে সর্ব্বদা হয় না।

তৃতীয়তঃ সে-দেশের লোকেরা যে বেশ মিশুক ও প্রিয়ভাষী এবং ব্যবহার যে তাঁহাদের খুবই ভাল, সেকথা শতমুখে স্বীকার করিতে হইবে।

কামনা

(শ্রীসুখেন্দ্রচন্দ্র পাল)

ওগো, জীর্ণ আমার
ছোট্ট কুটীর খানি—
তুমি এসে বসো আজি জুড়ে।
ছিন্ন আমার
বীণার বেসুর বাণী—
তোমার গানে বাজুক আজি সুরে।

ওগো, রুদ্ধ আমার
ঘরের সকল দোর
পদাঘাতে ফেলো আজি খুলি'।
বুদ্ধ আমার!
আঁধার হৃদে মোর—
তোমার জ্ঞানের দীপ্তি উঠুক জ্বলি'।

ওগো, রিক্ত আমার
ভিখারী হৃদয়—
তোমার দানে উঠুক আজি ভরে।
লিপ্ত আমার
বাজে কাজে মন—
নুয়ে পড়ুক তোমার কাজের ভারে।

ওগো, শূন্য আমার
ছিন্ন তরুর ডালে—
ফুটে উঠুক তোমার পূজার ফুল।
পুণ্য পূজার
ঘণ্টা বাজার তালে—
দুলে উঠুক আমার হৃদয় দোল।

ওগো, ক্ষীণা আমার
জীবন নদীর বুকে—
তোমার প্রেমের সুধা বহুক ছুটি'।
দীনা আমার
আশা-দূতীর চোখে—
তোমার আসার তৃপ্তি উঠুক ফুটি'।

কৌতুক-কণা।

বিজ্ঞাপনের ফন্দি ঃ—বিজ্ঞাপনের বহু রকম নমুনাই দেখা যায়; যেমন চোষ কাগজ দিয়া সাহায্য করিবার ছলে অনেকে বিজ্ঞাপন দেয় 'পেইন এণ্ড কোং, প্রসিদ্ধ পেন ব্যবহার করুন'; কেউ লিখে "মুছে ফেল কালির লিখা মুছোনা বন্ধুর ভিক্ষা"—এমন কত কি। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তেমনি ছাত্রদিগকে চিঠি লিখিবার কাগজ ও খাম দিয়া তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ধাম ছাপিয়া ওরকম বিজ্ঞাপন দেওয়া চলে।

* * * *

প্রত্যেক জিনিষের একটা season আছে, তাহাতে কোন কোন বিশেষ লক্ষণ ফুটিয়া উঠে; যাহা দেখিয়া season চিনা যায়। যেমন পলাশবনের ফুল দেখিয়া চিনা যায় বসন্ত আসিয়াছে। হলের মধ্যেও তেমনি B. C. Sএর season বুঝা যায় দৈনিক পত্র পড়ার ধূম দেখিয়া।

* * * *

শ্রীযুক্ত 'অ' বাবু নব বিবাহিত। বন্ধুদের সতর্ক চোখ এড়াইয়া নিরিবিলিতে পত্নীর পত্র-পাঠ তাঁহার দায় হইয়াছে! উকিল-বন্ধুদের পরামর্শে তিনি পত্নীকে "কল্যাণীয়" ও "আশীর্ব্বাদিকা" পাঠ লিখিয়া পত্র দিতে লিখিয়াছেন। শোনা যায় সম্প্রতি বন্ধুদের দৌরাত্ম্য হইতে তিনি অব্যাহতি পাইয়াছেন।

* * * * *

আমাদের বিখ্যাত খেলোয়াড় এতদিন গুপ্ত বিহার করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে হলে দক্ষ ও বিশেষজ্ঞগণের অভাব উপলব্ধি করিয়া দুই দুইটী আসন্ন পরীক্ষা থাকিলেও সর্ব্ববিধ দশের কার্য্যে উলুবনে মুক্তা ছড়ানর মত আপনার অসাধারণ সামার্থ্য ব্যয় করিতেছেন। অমৃতে অরুচি কার?

* * * * *

হলে নাকি জাল পুলিসের উপদ্রব হইয়াছে। কতিপয় বন্ধু রজ্জুতে সর্প-ভ্রম করিয়া দারুণ বিপদে পড়িয়াছিলেন। ননীদা বোবার শত্রু নাই স্মরণ করিয়া নীরবে কিল চুরি করিয়াছিলেন। একজন ভাবী ডেপুটীর নিকট পকেট সংস্করণ গীতা আবিষ্কার হওয়ায় তিনি সেখানাকে নোট-বই প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছিলেন। জনৈক বৈদেশিক বন্ধু একুল ওকুল, দুকুল যায় দেখিয়া ত ঘুষ দিয়াই খালাস। খাকী কোটের সহিত যার গিন্নির চিঠির তাড়া অন্তর্হিত হইয়াছিল, তাহার দুঃখ দেখিয়া নাকি পুলিশের চোখেও জল আসিয়াছিল। কিমাশ্চর্য্যং অতঃপরং।

* * * *

শ্রী'আ' বাবু মস্তবড় দার্শনিক, বাহ্যজ্ঞান তাঁর অনেক সময়েই থাকে না। সে বার হলের নাট্যাভিনয়ে Lady's day তে তিনি একখানা লেডী টিকিট নিয়া হাজির। দরজায় ভলান্টিয়ার বন্ধুদের কৌতুক প্রশ্নে জানা গেল, দার্শনিক প্রবর অভিনয়ের তারিখটাই শুধু দেখিয়াছিলেন; "Lady's day টুকু" দেখিবার অবসর তাঁর ঘটে নাই।

* * * *

'ই' বাবু স্বদেশ প্রীতিতে সম্প্রতি দ্বিজু কবির নন্দলালকেও ছাড়াইয়াছেন; তাই তিনি বড় সাধ করিয়া সেবাসঙ্ঘের 'চাঁই' সাজিয়াছেন। রোগের বীজাণুদ্বারা আক্রান্ত হইলে পাছে বৃহত্তর সমাজের সেবা ঘটিয়া না উঠে, এই ভয়ে তিনি রোগী বন্ধুর শুশ্রূষা করিতে নারাজ। তিনি মরিয়া বাঙ্গলার সর্ব্বনাশ করিবেন নাকি?

* * * *

শ্রীযুক্ত 'ঈ' বাবু পুলিশের লোক হইতে ইচ্ছা করেন। তাই পুলিশের কাজে আপন দক্ষতা সপ্রমাণ করাইয়া কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ হেতু হলের ভিতর সেদিন অর্ডিনান্সের ব্যঙ্গ অভিনয় করিয়া আপনার যোগ্যতার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন। আমরা কর্ত্তৃপক্ষকে উপদেশ দিতেছি যে, তাঁহাকে ছাড়িলে অমন হাতে কলমে পাকা লোক আর পাইবেন না।

* * * *

কিষ্কিন্ধ্যাখণ্ডের রামভক্ত প্রাতঃস্মরণীয় ও নিরামিষাশী বন্ধু নূতন বাংলা শিখিয়া বাজারে দোকানের নাম পড়িতেছিলেন, বসুমিত্র ত্রণু কোং। একটী পার্শ্বচর বন্ধু ভুল ধরিয়া দিলে পড়িলেন, বসুমিত্র এণ্ডু কোং। আমরা হলপ্ করিয়া বলিতে পারি যে, এতদিনে তিনি বাংলা ভাষায় বিশেষজ্ঞ হইয়াছেন। তিনি এবার বাংলা গীতাঞ্জলির উর্দ্দু সংস্করণ বাহির করিতে মনস্থ করিয়াছেন। ক্রেতাগণ সত্বর হউন!

* * * *

বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র পাকড়াশী একটী নূতন পাঠশালা খুলিয়াছেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়াই তাঁহার আন্তরিক বাসনা। ছাত্রও নেহাৎ কম জোটে নাই। পরলোকে আত্মার গতি সুগম করায় তাঁহার অদ্বিতীয় নৈপুণ্য। তাঁহার ছাত্রগণের আধ্যাত্মিক উন্নতি অতি দ্রুত হইতেছে। অবোধের গোবধে আনন্দ।

* * * *

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারের পদ খালি হইতেছে। পদপ্রার্থী অনেকেরই নাম শুনা যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শ্রীযুক্ত 'উ' মহাশয়ও নাকি আপনার দৈনিক শতকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রতিরোজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার প্রমুখ মহাপুরুষদের বৈঠকে যাওয়া আসা করেন

ও চায়ের মজলিশের খবরাখবর লইয়া থাকেন। তাহার উদ্দেশ্য কি? কর্ণধারগিরিটা বাগাইয়া লওয়া নয় ত?

* * * *

শ্রী 'উ' বাবুর জন্ম এই বাংলার মাটীতে; তাঁর মনটা নাকি খাঁটি বিলেতি। ইংরেজীতে তাই বাক্যবাগীশতা করেন, স্বপ্নও বোধ করি দেখতে অভ্যাস করেছেন, তবে ইংরেজীতেই চিন্তাটা করেন কিনা তা অন্তর্য্যামীই জানেন। তিনি সে দিন তাই বন্ধুদের বল্লেন, "ছ্যাঃ! বাংলা আবার একটা ভাষা, এতে না যায় 'আইডিয়া' প্রকাশ করা, না যায় সিরিয়াস্ কিছু লেখা"; ইত্যাদি ইত্যাদি। ইনি বোধ হয় সপ্তদশ শতাব্দী কিংবা আরও কিছু ঊর্দ্ধের লোক। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ মৃত প্রস্তর ফলক ছাড়িয়া এই জীবন্ত মাংস ফলকটীকে ধরিলে বহু তথ্য পাইতে পারেন।

* * * *

রাঘব গোপাল বাবু গণিত শিক্ষকের নিকট গিয়া বলিলেন—"স্যর, আমি যাহা পড়ি তাহা Natureএর সঙ্গে মিলাইয়া পড়ি। তবে Differential calculusটার সঙ্গে কোথায় যোগ, তাহা........" এই বলিয়াই মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। শিক্ষক ইহার কি উত্তর দিয়াছিলেন জানা যায় নাই; তবে শোনা যায় সহপাঠীরা তাহাকে নিম্নলিখিত Formulaটি দিয়াছিল—

$$\text{Lt.} \frac{\text{জ্যেঠামশায় + জ্যেঠিমা}}{\text{নিঃসন্তানতা}} = \text{বার্দ্ধক্যে ছাত্রজীবন।}$$

* * * *

"লোটা ও কম্বল" ভারতীয় আধ্যাত্মিক জীবনের চিরন্তন সম্বল হইলেও নেহাৎ অকাব্যি ও অসাহেবি বলিয়া হলের ছাত্রবাবুদের অনেকেরই লোটা নাই। তাই ভোরের নেহাৎ অপরিত্যাজ্য অকাব্যিটা সারিবার কালে ম্যানেজারের কেনা আচমনের "মগ" চুরি (না বলিয়া লওয়া) করিতে হয়। নিরুপায় ম্যানেজার বহুবুদ্ধি খরচ করিয়া এবার মগগুলির তলায় ছিদ্র করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে আঁচমনের কার্য্য পূর্ব্ববৎ চলিতেছে, কিন্তু "সে-টা" চলে না বলিয়া চুরি চলিতেছে না।

* * * *

হলে কল্কি অবতার প্রকট হইয়াছেন, ইতি মধ্যেই দূর-দূরান্ত হইতে বহু কল্কি-সেবক প্রভুর পার্শ্বচর জুটিয়াছে শোনা যায়। লীলার নিত্যরসে অভক্তেরও ভক্তি সঞ্চার হইয়াছে।

দুঃখের বিষয় প্রভুর লীলাকাল আর চারি মাস মাত্র। অনন্তর তিনি বার লাইব্রেরীতে জুনিয়ার উকিলরূপে আবির্ভূত হইবেন। তখন ছিলিমের পয়সা জুটিবে ত ?

* * * *

কথায় বলে "ভোজনে দেড়া কাজে এঁড়া"—বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া প্রদর্শনীতে কাছি টানার দ্বন্দ্বেও নাকি তাই হলের ভোজন-সর্ব্বস্ব মহাশয়গণ সযত্নে দূরত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন।

* * * *

আমরা শুনিতে পাইয়াছিলাম যে সস্ত্রীক নিমন্ত্রিত না হওয়ায় আমাদের কোন কোন শিক্ষক মহাশয় ত্রুটি গ্রহণ করিয়া নাট্যাভিনয় বয়কট্ করিয়াছিলেন। ইহার কৈফিয়ৎ চাওয়ায় সেক্রেটারী বলিলেন যে, তাঁহারা যে বিবাহিত তিনি তাহা অবগত ছিলেন না। আশা করা যায় যে, ভবিষ্যতে শিক্ষক মহাশয়গণ অনুগ্রহ করিয়া দার-পরিগ্রহের শুভ নিমন্ত্রণটা আমাদিগকে দিতে ভুলিবেন না ; তাহা হইলেই আর আমাদের কোন ত্রুটির সম্ভাবনা থাকিবে না।

* * * *

প্রোভোষ্ট—তুমি ইম্পিরিয়াল্ টোবেকো কোম্পানীর চাকুরী চাও ?—তা' বেশ, ইজিপ্সিয়ান্ টোবেকো সম্বন্ধে কি জান ?

গোপাল : কিছুই জানি না, স্যর।

প্রোভোষ্ট। ইণ্ডিয়ান্ টোবেকো সম্বন্ধে কিছু জান কি ?

গোপাল। আজ্ঞে, ইহা ইণ্ডিয়াতে জন্মায়।

প্রোভোষ্ট। আচ্ছা, তবে ইজিপ্সিয়ান্ টোবেকো কোথায় হয় ?

গোপাল। জানি না, স্যর।

প্রোভোষ্ট (সহাস্যে)। টোবেকো কাহাকে বলে জানত ?

গোপাল। হ্যাঁ স্যর—It is a kind of Tree !

একটী কথা

[শ্রীওয়াল্টার এলান্ জেঙ্কিন্স্,]

আজ অনেকদিন পরে হাতে কলম নিয়ে আমি আবার বাঙ্গলা লিখিতে চেষ্টা করিতেছি। আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এত কাজ যে, আমার বাঙ্গলা পড়িবার বা লিখিবার অবসর হয় না। ইহা আমার নিজের পক্ষে বিশেষ ক্ষতি মনে করি। ঢাকাকলেজ থাকিতে যখন আমার অবসর হইত তখন আমার বাঙ্গলা পড়িতে ও লিখিতে ভাল লাগিত। আজ সেই দিন চলিয়া গিয়াছে। আজকাল ভোরে সূর্য্যের প্রথম কিরণ বিকাশ হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত কেবল নানাবিধ সভায় হাজির হওয়া ভিন্ন প্রায়ই আর বিশেষ কাজ দেখি না; কাজেই বাঙ্গলা ভাষার চর্চ্চায় আমার অবকাশ হয় না। এই কারণে আমার বাঙ্গলা লেখা ভাল না হওয়াই সম্ভব। এজন্য যাঁহারা আমার এই সামান্য দুই একটী কথা পড়িবেন, তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া আমার ত্রুটী মার্জ্জনা করেন। যেদিন আমি শুনিলাম যে, এই বৎসর হইতে আমাদের হলের পত্রিকায় শুধু বাঙ্গলায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে, তাহাতে প্রথমে আমি দুঃখিত হইয়াছিলাম। কিন্তু এ-বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে ইহাই যেন ভাল। যাঁহারা ইংরেজীতে প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছা করিবেন, তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাগাজিনে তাহা প্রকাশ করিতে পারিবেন। বিদেশী ভাষায় প্রবন্ধ লেখা অবশ্য ভাল বই মন্দ নয়। মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য বিদেশী ভাষা এক পক্ষে মাতৃভাষার অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী। যখন আমরা মাতৃভাষায় প্রবন্ধ লিখি, তখন সময় সময় আমরা ধীর ভাবে বিবেচনা না করিয়া যেন কতকটা আত্মহারা হইয়া হয় মিথ্যা, কিম্বা আংশিক সত্য—ভাব প্রকাশ করি। আমার মনে হয়, বিদেশী ভাষায় লিখিলে সত্য ভাব আপনা হইতে প্রকাশিত হয়। আবার স্পষ্ট করিয়া ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য মাতৃভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। এখন হ'তে আমাদের ঢাকাহলের ছাত্রবৃন্দ তাহাদের মনোভাব ও চিন্তাশক্তির সম্যক বিকাশের উদ্দেশ্যে তাহাদের নিজের ভাষায় হল পত্রিকায় তাহাদের প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে পারিবে, এজন্য আমি বিশেষ আনন্দিত এবং এ কার্য্যে তাহাদের সম্পূর্ণ সফলতা কামনা করি। আর আমিও আশা করি যে, এই মহৎ উদ্দেশ্যে লিখিত এবং পরিচালিত তাহাদের এই পত্রিকাখানি, এই শ্রেণীর পত্রিকার মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিবে। আমার পক্ষে আর অধিক কথা লেখা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। আশা করি, আমাদের পাঠকবর্গ আমার এই যৎসামান্য লেখাটুকু পাঠ করিয়া আমার বাঙ্গলা লেখায় অপারদর্শিতার জন্য আমায় ক্ষমা করিবেন।

———

আমাদের কথা

আমাদের হলের স্থায়ী প্রোভোষ্ট মিঃ জি, এইচ, ল্যাঙলী এক বৎসরের ছুটীতে স্বদেশে গিয়াছেন। আগামী জুলাই মাসে তাঁহার ছুটী ফুরাইবে।

মিঃ ডব্লিউ, এ, জ্যাঙ্কিন্স বর্ত্তমানে অস্থায়ী ভাবে প্রোভোষ্টের কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতাগুণে আমাদিগকে মিঃ ল্যাঙলীর অভাব বোধ করিতে হয় নাই।

মিঃ জ্যাঙ্কিন্স হলের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। হলের ছাত্রদের সামাজিক জীবন যাহাতে উন্নত হয় ও পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে, তাহার জন্য বর্ত্তমান প্রোভোষ্ট যত্ন করিতেছেন। ছেলেদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরশীলতা এবং সুসংবদ্ধ ও সংযত ভাবে জীবন যাপন স্পৃহা জাগাইয়া তুলিতে তিনি চেষ্টা করিতেছেন। তিনি হল-সম্পর্কীয় যাবতীয় শাসন ভার হলের ছাত্রদের হাতে তুলিয়া দিতে প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা এই যে, শাসনদণ্ড অপরের হাতে থাকিলে, যে ভুল করে তাহার শাস্তি অবশ্যই হয়, কিন্তু ভুলের শাস্তি ও সংশোধন হয় না; বরং নিজ হাতে নিজের দণ্ডবিধি থাকিলে মানুষের ভুল ত্রুটি আপনি শোধরাইয়া যায়। তাই আত্মোন্নতির এবং নিজের ভুল বুঝিবার ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়।

* * *　　　　* * *　　　　* * *

এবার আমাদের হলের ছাত্র সংখ্যা গত বৎসর হইতে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, তাই হলে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় স্থানান্তরে ছাত্রদের থাকিবার বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছে।

সম্প্রতি নূতন লাট ভবনের পশ্চাদ্বর্ত্তী বাড়ীটা আমাদের হলের অন্তর্গত করিয়া তাহাতে ২২টী ছেলেকে থাকিতে দেওয়া হইয়াছে।

আমাদের ঢাকা হলে এত ছেলে থাকিতে চায় যে, প্রতি বৎসরই অনেক ছেলেকে ফিরাইয়া দিতে হয়। তাই হলের স্থান আরো প্রসারিত করা দরকার। নূতন রমনা হাউস প্রধান হল হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরবর্ত্তী হওয়ায় সেখানকার ছেলেদিগের হল বাসের সকল সুবিধা ভোগ করা হইয়া উঠে না। লাইব্রেরী, কমন রুম, প্রভৃতির ব্যবহারে তাহাদিগকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

* * *　　　　* * *　　　　* * *

গত অক্টোবর মাসে নূতন বৎসরের 'হল ইউনিয়ান্ কাউন্সিল' গঠনের জন্য ভোট গ্রহণের সভা হইয়াছিল। সভায় হলের অধিকাংশ ছেলেই উপস্থিত হইয়াছিল। কাউন্সিলের সাধারণ সভ্য ও বিভিন্ন বিভাগ সমূহের সেক্রেটারীর পদ প্রভৃতি লইয়া ছেলেদের মধ্যে ভোটের লড়াই এবারো খুব তীব্র হইয়াছিল। বাহিরে দেশ বিদেশে বড় বড় কাজে ও সংগঠনে, কাউন্সিল বা মন্ত্রীসভায় যেমন চাঞ্চল্য দেখা যায়, ভোট নিয়া যেমন কাড়াকাড়ি হয়, আমাদের হলেও কাউন্সিলার পদ লইয়া সর্ব্বতোভাবে ঐ সব কার্য্যকলাপের প্রতিচ্ছবি দেখা গিয়াছিল।

এবার হলে দুইটী প্রধান দল গড়িয়া উঠিয়া ভোটের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে আরো তীব্র করিয়া তুলিয়াছিল। যে দলের ছেলেরা জয় লাভ করিয়াছে, তাহারা পূর্ব্ব হইতেই আপনাদের একটী কার্য্যতালিকা প্রস্তুত করিয়া, অতীতের ভুল সংশোধনের উপায় দেখাইয়া এবং উন্নতির আশা দিয়া আপনাদের দল মত প্রবল করিয়াছিল। ইহারা আপনাদের মধ্য হইতে ভোট লইয়া যাহাদিগকে দাঁড় করাইয়াছিল, তাহারাই শেষে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত ছাত্রগণ এবারকার কাউন্সিলের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ভাইস্ প্রেসিডেন্ট — শ্রীরাখাল চন্দ্র দত্ত।
খেলার সেক্রেটারী " পরেশ নাথ রায়।
লাইব্রেরী " — " বীরেশ লোচন সেন।
কমন রুম " — " মহেন্দ্র নাথ দত্ত বি, এ।
নাট্য " — " ব্রজ গোপাল গাঙ্গুলী।
সমাজ সেবা " — " সমরেন্দ্র কিশোর রায়।
ম্যাগাজিন্ " — " পরেশচন্দ্র নন্দী।

সাধারণ সভ্যগণ :—শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বি, এ; শ্রীকুমুদ রঞ্জন চৌধুরী, বি, এ; শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বি, এ; শ্রীশৈলেশচন্দ্র রায়; শ্রীসুধীরচন্দ্র দাসগুপ্ত, বি, এস্‌সি; শ্রীমহীন্দ্রনাথ রায়; শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ দাস।

নির্ব্বাচনী সভার অতি অল্প দিন পরেই পূজার ছুটী আরম্ভ হয়; তাই ছুটীর পরে ১০ই নভেম্বর সন্ধ্যা বেলায় কার্জ্জনহলস্থ বিরাট সভাকক্ষে নূতন কাউন্সিলের সভ্যদিগের অভিষেক উৎসব সুসম্পন্ন হয়। কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট মিঃ ডব্লিউ, এ, জ্যাঙ্কিন্স্; সভাপতি হয়েন। আমাদের ভাইস্ চ্যান্সেলার মিঃ হার্টগও সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের মধ্যেও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

উৎসবের উদ্বোধন হয় একটী সুমিষ্ট গানের ভিতর দিয়া; পুরাতনকে বিদায় দিয়া নূতনের বরণে সে সভার দৃশ্য বেশ সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পুরাণো সেক্রেটারী তাহার বাৎসরিক বিবরণ পাঠ করিলে পর একটী একটী করিয়া পুরাতন সভ্যকে বিদায় দিয়া তাহাদের স্থলবর্ত্তী নূতন সভ্যকে প্রোভোষ্ট করমর্দ্দন পূর্ব্বক কার্য্যে ব্রত করেন। নূতন ভাইস্-প্রেসিডেন্ট আপনার ভবিষ্যৎ কার্য্যপদ্ধতি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অনেক আশার বাণী পাঠ করেন; ভাইস্ চ্যান্সেলার মহোদয়ও একটী নাতিদীর্ঘ সদুপদেশপূর্ণ বক্তৃতা দেন। আবার আর একটী সঙ্গীতে উৎসবের সমাপ্তি হয়।

গেল বারের কাউন্সিল হইতে এবারকার কাউন্সিলের গঠন বিষয়ে অনেক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা হইয়াছে। এবার হইতে নূতন নির্ব্বাচনী সভার অধিবেশন হইবে জুলাই মাসে। তাই এবারকার উৎসাহশীল নূতন সভ্যগণের কার্য্যকাল অনেকখানি কমিয়া গিয়াছে। তাহার উপর

আগামী জুলাই মাসে পুনঃ নির্ব্বাচন হইবে বলিয়া এবারে নাট্য-বিভাগীয় সেক্রেটারী কোন কাজ দেখাইতে সুযোগ পাইলেন না। আশা করি আগামী নির্ব্বাচনীতেও হলের ছাত্রবৃন্দ তাঁহাকেই পুনরায় নির্ব্বাচন করিবেন।

কাউন্সিলের সভ্যগণ আপনাদের প্রতিজ্ঞা স্মরণ রাখিয়াই কার্য্য করিতেছেন। একটা স্থির লক্ষ্য ও মহৎ উদ্দেশ্য নিয়া পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য ও সহানুভূতি দেখাইয়া কাউন্সিলকে একটা সংহত, একক্রিয় সমষ্টি করিবার এই প্রচেষ্টাই তাঁহাদের বিশেষত্ব।

সম্প্রতি সমাজ-সেবা বিভাগের সেক্রেটারী পদত্যাগ করায় তাঁহার স্থলে শ্রীকিরণচন্দ্র দাস নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

হলের এই কাউন্সিল দেশ বিদেশের বৃহত্তর কাউন্সিলেরই একটা ক্ষুদ্র, অনুরূপ প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ইহাতেও তেমনি দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও কার্য্যকুশলতার প্রয়োজন হয়। তাই ইহাও ছাত্রদের শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ। এখান হইতেই ছাত্রগণ শিক্ষা পাইয়া যায়, ভবিষ্যতে বৃহত্তর অনুষ্ঠানে কি ভাবে আপনাদের বিচক্ষণতা ও শিক্ষা দীক্ষাকে প্রতিফলিত করিতে হইবে। দেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতিজ্ঞ ও নায়ক হয়ত এখান হইতেই গড়িয়া উঠিবে।

* * * * * * * * *

চির প্রচলিত প্রথামত এবারও হলের নাট্যাভিনয় পূজার ছুটীর অব্যবহিত পূর্ব্বেই সম্পন্ন হয়। ২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর—এই দুই রাত্রি অভিনয় হয়; প্রথম রাত্রি শুধু পুরুষদের জন্য এবং দ্বিতীয় রাত্রি শুধু মেয়েদের জন্য।

আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় ৺বঙ্কিমচন্দ্রের সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস "দেবী চৌধুরাণী" হলের ছেলেদের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া নাট্যাকারে লিখিয়া দেন। তাহাই অভিনীত হইয়াছিল। "দেবী চৌধুরাণী" অভিনীত হইবার সাথে সাথেই ৺গিরিশ চন্দ্রের "য্যায়সা কা ত্যায়সা" প্রহসনটীও অভিনীত হয়। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী উভয় অভিনয়ই দর্শন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন।

১৯০৯ সন হইতে আরম্ভ করিয়া পুরানো ঢাকা কলেজে প্রতিবৎসর একটী করিয়া অভিনয় সম্পন্ন হইয়া আসিতেছিল। আমাদের হল উত্তরাধিকার সূত্রে পূর্ব্বতন ঢাকাকলেজের গৌরবময় কীর্ত্তি-গাথা লাভ করিয়াছে। এই নাট্যাভিনয় হলের অন্যতম অনুষ্ঠান। পূর্ব্বের সেই সুনামের জোরে আজও সহর ভাঙ্গিয়া ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ আমাদের অভিনয় দর্শনে আসিয়া থাকেন। তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্যে বুঝা যায়, আমাদের হাতে আসিয়াও পুরাতন কীর্ত্তি অম্লান রহিয়া গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় তাঁহার পূর্ব্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনা লইয়াই আমাদিগকে অভিনয়ে শিক্ষা দিয়াছিলেন; অভিনয়ের কৃতকার্য্যতা তাঁহারই হাতের দান। আশা করি

তিনি অমনি ভাবে আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়া ও সাহায্য করিয়া আমাদের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবেন।

নাট্যের সেক্রেটারী শ্রীহেমেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ও অভিনয়ের সফলতাকে শ্রীমণ্ডিত করিবার জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকেও ধন্যবাদ জানাইতেছি।

হলের ছাত্রজীবনে অভিনয় অতি প্রয়োজনীয়। বই এবং বক্তৃতাগৃহ ছাড়িয়া একটু নির্ম্মল আনন্দ ভোগ হলের একঘেঁয়ে জীবনে একটা বৈচিত্র্য ও সজীবতা আনিয়া দেয়।

দুঃখের বিষয় হলের আর্থিক অবস্থা এত দীন হইয়া পড়িয়াছে যে, পূর্ব্বের ন্যায় অর্থ ব্যয় করিয়া সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ভাবে অভিনয় করা অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর ঢাকা কলেজের সেই মান্ধাতার আমলের পুরাণো জীর্ণ দৃশ্যাবলী (scenes) লইয়া আমাদিগকে অভিনয় করিতে হয়। শুনিতেছি এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এ অভাব মোচনে মনোযোগী হইয়াছেন।

* * * * * * * * *

খেলাতেও আমাদের হল যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিতে পারিয়াছে। ঢাকা কলেজ খেলার জন্য সুখ্যাত ও সুকীর্ত্তিত ছিল, ঢাকা হলও সেই গৌরব বজায় রাখিয়াছে। আমাদের প্রোভোষ্ট মিঃ জ্যাঙ্কিন্স্ স্বয়ং একজন নামকরা খেলোয়াড়। তিনি এখনো নিজে মাঠে নামিয়া ছেলেদিগকে উৎসাহিত করিয়া থাকেন।

এই বছরের ফুটবল খেলায় আমাদের হলের ছেলেদের তেমন উৎসাহ দেখা যায় নাই। নানা কারণেই ফুটবল খেলা ভাল হয় নাই। একমাত্র "শঙ্খনিধি শিল্ড" ম্যাচে হল যোগদান করিয়াছিল। অন্য কোন প্রতিযোগিতায়ই যোগ দেয় নাই।

কিন্তু স্বতন্ত্র খেলাতে হলের গৌরব ক্ষুণ্ণ হইলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে সকল খেলাতেই আমাদের প্রাধান্য ছিল। বলিতে গেলে, ঢাকা হলের ছাত্রবৃন্দই বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলাদল গঠন করিয়া থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দল পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত ম্যাচ খেলিতে গিয়াছিল; সে দলে ঢাকা হল হইতেই ৬জন খেলিয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সব খেলাতে আমাদের সব ছেলে চলিয়া যাওয়াতে স্থানীয় আর কোন প্রতিযোগিতায়ই হল যোগ দিতে পারে নাই। এবার ফুটবল খেলায় ৪০০ শত টাকা ব্যয় করা হইয়াছিল।

ক্রিকেট খেলায়ও হলের ছাত্রদের আগ্রহ ও উৎসাহ খুবই প্রবল। ফুটবল খেলার মত এ খেলাতেও আমাদের হল সুপরিচিত। মিঃ জ্যাঙ্কিন্স্ নিজে একজন দক্ষ ও পটু ক্রিকেট খেলোয়াড়। হলের টিম তাঁহার উৎসাহে বিশেষ উন্নত হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট টিমের কেপ্টেন্ ও সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হইয়াছে, আমাদের হল হইতে; এবং এই টিমে আমাদের ১০টি ছেলে খেলিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলাকেও তাই আমাদের খেলাই বলা যাইতে পারে।

হল হইতে স্বতন্ত্র ভাবে বিশেষ কোন ক্রিকেট্-ম্যাচ্ খেলা হয় নাই। মাত্র "নেথান কাপ" ম্যাচ আমরা খেলিয়াছিলাম।

রৌদ্রে ক্রিকেট খেলা কষ্টকর; তাই প্রত্যেক খেলোয়াড়কে হ্যাট্ দেওয়া প্রচলিত প্রথা। কিন্তু খেলোয়াড়দের হ্যাট্ এবার না-মঞ্জুর করা হইয়াছে। মনঃক্ষুণ্ণ ছাত্রগণ তাই এবার ক্রিকেট খেলে নাই। আমাদের মনে হয় হ্যাট্ মঞ্জুর করাটাই যুক্তিসঙ্গত ছিল। এইরূপ ব্যবস্থা করিলেই হইত যে, খেলা শেষে হ্যাট্গুলি প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।

ক্রিকেটে এবার ৩০০৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে। এবার নাকি হলের খেলা বিভাগে অত্যন্ত অর্থাভাব, ইহার কারণ কি? আমাদের মনে হয়, হলের টাকা মঞ্জুরি কমাইয়া দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার ভিন্ন ভিন্ন টিমগুলি তৈরী না করিলেও চলে; প্রত্যেক হল হইতে যেমন খেলোয়াড় নেওয়া হয়, তেমনি খেলার সরঞ্জাম (অর্থাৎ ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদি) প্রত্যেক হল হইতেই পাওয়া যাইতে পারে। তাহা না করায় একদিকে যেমন বৃথা অর্থব্যয় হইতেছে, অপরদিকে তেমনি অর্থাভাব ঘটিতেছে। হলগুলির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি, ইহাই আমাদের অভিমত।

বর্ত্তমানে হলের 'হকি' খেলায়ও আমাদের যুবকগণের প্রবল উৎসাহ দেখা যাইতেছে। হকির জন্য এবার ৩০০৲ শত টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

'হকি', ক্রিকেট প্রভৃতি ডানপিটে খেলায় যাহাদের উৎসাহ নাই, তাহাদের জন্য হল প্রাঙ্গনে 'ব্যাড্মিণ্টন্' খেলার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এই খেলায়ও ছেলেদের খুব আগ্রহ দেখা যায়। 'ব্যাড্মিণ্টনে' এবার ১২০৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। নূতন রমনা হাউসেও ব্যাডমিণ্টনের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

টেনিস্ খেলা হলের একটা বিশেষত্ব স্বরূপ; অনেক ছেলেই ইহাতে যোগ দিয়া থাকে, এবং অধিকাংশেরই ঝোঁক দেখা যায় এই খেলাতে। এবার নূতন আর একটী টেনিস্ কোর্ট তৈরী করান হইয়াছে; এখন মোটের উপর তিনটী টেনিস্ কোর্ট হইল। এবার টেনিস্ ফিল্ডের চতুর্দ্দিকে জালের বেড়া দেওয়া হইয়াছে। টেনিসের জন্য ৫০০৲ শত টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। আমরা টেনিস্ খেলার আরো উন্নত বন্দোবস্ত আশা করি। যাহাতে অধিকাংশ ছেলের উৎসাহ প্রকাশ পায়, তাহার উন্নতিই যথার্থ উন্নতি।

টেনিস্ খেলার এই প্রবল ঝোঁকের মূলে টেনিস্ টুর্ণামেণ্ট। হলের টেনিস্ টুর্ণামেণ্ট খুবই সুন্দর হইয়াছিল; বহু ছেলে যোগ দেওয়ায় প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্ব খুব প্রবল হইয়াছিল। হল-টুর্ণামেণ্টের বিজয়ী বীর (champion) শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত ইউনিভারসিটি টেনিস্ টুর্ণামেণ্টের সিঙ্গল্স্ (singles) প্রতিযোগিতায়ও বিজয়ী (champion) হইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিতেছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের টেনিস্ টুর্ণামেণ্টের ডাবল্স্ (doubles) প্রতিযোগিতায় এই যুবক ও তাহার সঙ্গী শ্রীললিতকুমার বন্দোপাধ্যায় 'ফাইনেল্' পর্য্যন্ত খেলিয়াছিল। প্রবল প্রতিপক্ষের সহিত হারিয়াও ঐই যুবকযুগলের বাহাদুরী বাড়িয়াছে বই কমে নাই।

এবার খেলায় একটী নূতন জিনিষের আমদানী করা হইয়াছে। এবার হইতে হলে 'ভলি বল' প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। সেক্রেটারীর এইরূপ প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। যতদিক দিয়া সম্ভব ছাত্রদিগকে খেলায় উৎসাহিত করা দরকার। স্বাস্থ্যহীন পড়ুয়াদের প্রলোভন দেখাইয়াও খেলায় টানিয়া আনা দরকার; আমরা তাই আশা করি, ভবিষ্যৎ সেক্রেটারী 'ভলি বল টুর্ণামেণ্ট', সাঁতার প্রতিযোগিতা, water polo, প্রভৃতি খেলার প্রবর্ত্তন করিয়া খেলায় ছাত্রদিগকে আরো জাগ্রত করিয়া তুলিবেন।

সারা বৎসরের খেলাধূলার আনন্দোৎসবটুকু হইয়া থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস্-এ। ইহাতেও আমাদের হল বরাবরই সুনাম উপার্জ্জন করিয়া থাকে। ক্রমাগত তিন বৎসর যাবৎ "হল প্রতিযোগিতায়" ঢাকা হল বিজয়ী হইতেছে। এবারো আমাদের হল চেম্পিয়ান্ হইয়াছে। তবে এবার যেরূপ নম্বর (point) পাইয়াছে, তেমন আর কোন বার পায় নাই; এবার ৭৯ নম্বর হল লাভ করিয়াছে।

ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতাতেও আমাদের অন্যতম বন্ধু শ্রীযুক্ত উষাপ্রসন্ন নাহা চেম্পিয়ান হইয়াছেন; তাঁহার এই কৃতকার্য্যতায় আমরা গৌরবান্বিত। আমাদেরই হল হইতে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দাস দ্বিতীয় চেম্পিয়ান হইয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের নামও উল্লেখযোগ্য। প্রতিযোগিতাতে তিনিও বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

এবার 'কাছি টানাতে' আমাদের হলের কৃশ ছেঁলেরা বিরাটকায় বিপক্ষের সহিত যেরূপ ভাবে টিঁকিয়াছিল তাহা যথার্থ-ই অদ্ভুত। যাহাদের সঙ্গে হারিয়াছি, তাহাদের সঙ্গে হারায় তেমন লজ্জার কথা কিছুই নাই।

* * * * * * * * *

এবার হলের কমনরুমের জন্য ২৫০৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে কমন রুমের ব্যয় সঙ্কুলান না হওয়ায় ঘরের খেলাগুলি (indoor games) খেলা বিভাগের সেক্রেটারীর হাতে দেওয়া হইয়াছে; পূর্ব্বে এগুলি কমন রুমের সেক্রেটারীর অধীনে ছিল।

কমন রুমে 'পিংপং' 'কেরম', দাবা প্রভৃতি সকল রকম খেলারই বন্দোবস্ত আছে। রমনা হাউসকেও একটা কেরম বোর্ড দেওয়া হইয়াছে।

কমন রুমে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক ইংরেজী এবং বাংলা প্রসিদ্ধ সব পত্রিকাগুলিই রাখা হয়। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী মানসী ও মর্ম্মবাণী, স্বাস্থ্য, ভারতী, বঙ্গবাণী, প্রবর্ত্তক

পল্লিশ্রী, প্রাচী প্রভৃতি বাংলা মাসিক, মডার্ণ রিভিউ, কলিকাতা রিভিউ, ওয়েল্‌ফেয়ার, ইণ্ডাষ্ট্রি প্রভৃতি ইংরেজী মাসিকগুলি রাখা হইয়াছে।

সাপ্তাহিকের মধ্যে ইয়ং ইণ্ডিয়া, দি হিন্দু, দি বোম্বে ক্রনিকল, দি লিডার, কলিকাতা গেজেট, বিজলী, আত্মশক্তি, ইলাষ্ট্রেটেড টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি রাখা হয়। দৈনিক পত্রিকার মধ্যে ফরওয়ার্ড, ষ্টেটস্‌মেন, বেঙ্গলী, অমৃতবাজার, আনন্দবাজার, দৈনিক বসুমতী আছে। ইহার কয়েকটা এবার নূতন রাখা হইয়াছে।

কমন রুমে সর্ব্বক্ষণের জন্য একজন 'বেয়ারা' রাখা হইয়াছে। তাহাতে বেলা ১১টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত কমন রুম খোলা রাখার সুবিধা হইয়াছে।

এতদিন যাবৎ কমন রুমের স্থানাভাবে আমাদিগকে অত্যন্ত অসুবিধা ভুগিতে হইতেছিল। একই রুমে কমন রুম ও লাইব্রেরী দুইই থাকাতে উভয় দিকের কাজেই ব্যাঘাত হইতেছিল। এতদিনে সে অসুবিধা নিবারিত হইতে চলিল। কমন রুম, লাইব্রেরী, প্রোভোষ্ট আফিস প্রভৃতির জন্য ভিন্ন করিয়া একটা দালান তৈরী হইতেছে। আগামী সেসনেই সেখানে কমন রুম, লাইব্রেরী প্রভৃতি স্থানান্তরিত হইবে। তাহা হইলে কমন রুম আরো সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিবে।

বর্ত্তমান কমন রুমে যে দুই একটা পুরাণো ঢাকা কলেজের জীর্ণ কীটদষ্ট ছবি আছে, সেগুলি বদলাইয়া নূতন ছবি আনাইয়া নূতন কমন রুমকে একটু ভদ্রভাবে সাজাইতে আমরা ভবিষ্যৎ সেক্রেটারীকে অনুরোধ করিতেছি। কারণ, কমন রুমটী দেখিতে সুন্দর হওয়াও দরকার।

* * * * * * * * *

লাইব্রেরী আমাদের হলের আর একটা বিশেষত্ব, যার জন্য আমরা গৌরব বোধ করিতে পারি। বাংলার খুব কম কলেজ হোষ্টেলেই এমন বড় এবং সুন্দর লাইব্রেরী আছে। ঢাকাহল-বাসী ছাত্রবৃন্দের ইহাতে একটা বড় সুবিধা।

এই লাইব্রেরীর প্রথম সংগঠন হয় পুরাণো ঢাকাকলেজ হোষ্টেলের কতিপয় সংখ্যক বই লইয়া; তারপর বছর বছর বই জমা করিয়া ইহাকে এত বড় করা হইয়াছে। গতবৎসর পর্য্যন্ত মোট বইয়ের সংখ্যা ছিল ১২০০; এবার নূতন আরও ৫০০ শত বই আসিয়াছে। ইহার কিছু এ বৎসরের মঞ্জুরী টাকা দ্বারা ক্রয় করা হইয়াছে; অপরগুলি গত বৎসরই বিলাত অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল। বিলাতে এবারো প্রায় ৩০০ শত বইয়ের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইলে মোট পুস্তক সংখ্যা দাঁড়াইবে প্রায় ২০০০ হাজার। এবার লাইব্রেরীর জন্য ২৫০৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। ইহাতে ইংরেজী, বাংলা সর্ব্বপ্রকার বই-ই ক্রয় করা হইয়াছে। এবার সব বিষয়েরই কিছু কিছু করিয়া অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তকও আনান হইয়াছে। ইহাতে দরিদ্র ছাত্রদের খুবই সাহায্য হইয়াছে।

বাংলা বইয়ের তালিকা :— উপন্যাস ২৪০, জীবনী ৫১, ভ্রমণবৃত্তান্ত ২০, সাহিত্য ১৫৭, নাটক ৫৫, কাব্য ৪৫, গল্প ৮৫, ইতিহাস ৪৬, ধর্ম্মবিষয়ক ৪৮, অন্যান্য ৩০।

ইংরেজী বই :— উপন্যাস ৪৫৪, নাটক ৩৫, কাব্য ২৫, সাহিত্য ১১০, ভ্রমণ ৪, জীবনী ২৩, ইতিহাস ৬৭। ভ্রমণ ৪৪, অর্থশাস্ত্র ৪১, পদার্থবিদ্যা ২৬, রসায়ণ ২২, সাধারণ বিজ্ঞান ১৬, অঙ্ক ৬, অন্যান্য ৪০।

লাইব্রেরীর ব্যবহার হলের Attached এবং Resident ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। হলে দুই রকম ছাত্র আছে :—(১) Resident —অর্থাৎ যাহারা হলের অধিবাসী ; (২)) Attached অর্থাৎ যাহারা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত সকল বিষয়ে হলের অধীন, অথচ তাহারা হলে বাস না করিয়া অভিভাবকদের অধীনে থাকে।

Attached ছাত্রদিগকে সপ্তাহে দুইদিন লাইব্রেরী হইতে বই নিতে দেওয়া হয়। Resident ছেলেরা প্রতিদিনই বই পাইয়া থাকে।

লাইব্রেরীর ব্যবহার ছেলেদের মধ্যে খুবই ব্যাপক। গড়ে প্রতিদিন ২০টী ছেলে লাইব্রেরী হইতে বই নিয়া থাকে, এবং প্রতিদিন গড়ে ৫৫ খানা বই বাহিরে ছেলেদের ব্যবহারে থাকে। বইয়ের অপব্যবহারও মন্দ হয় নাই ; গত বছর মোট ১০ খানা বই হারাণো গিয়াছে। ভবিষ্যতে যাহাতে ঐরূপ না হয়, তাহার জন্য কঠোর নিয়ম প্রবর্ত্তন করা দরকার।

ইংরেজী উপন্যাসের তুলনায় বাংলা উপন্যাসাদি নিতান্ত কম। এমনো অনেক ইংরেজ বই আছে যাহা কোন ছেলেই কোন দিন পড়িয়া দেখে না, ভবিষ্যতে দেখিবে অমন ভরসাও নাই। অনেক পুস্তকের পাতাই এখনো কাটা হয় নাই। এইরূপ বইএর জন্য অর্থব্যয় অর্থের অপব্যবহারই বলিতে হইবে। আমরা আশা করি, ঐ রকম বইএর জন্য আর টাকা ব্যয় না করিয়া যে সব বই ছেলেরা বিশেষ আনন্দের সহিত পড়িয়া থাকে, সেরূপ বাংলা বই আনান হইবে।

* * * * * * * * *

সমাজ সেবা বিভাগ আমাদের হল ইউনিয়ানের আর একটা উল্লেখযোগ্য বিভাগ। মানসিক শিক্ষার সাথে সাথেই ভবিষ্যৎ কর্ম্মক্ষেত্রের কিছু কিছু জ্ঞান এখান হইতেই হাতে কলমে শিখিয়া লইবার ইহা একটা উত্তম সুযোগ। এই সেবাব্রতের কাজও আমাদের সুন্দর ভাবে চলিতেছে।

এই সেবাসংঘের সর্ব্বপ্রধান কাজ হইতেছে একটী অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা। ঢাকাহলের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পাল্লীগ্রাম ও সহরের অনুন্নত শ্রেণীর বালকদিগকে শিক্ষার আনন্দ ও সভ্যতার একটু আলো—দেওয়াই এই সংঘের উদ্দেশ্য।

বর্ত্তমান বছরের প্রথম ভাগে এই অবৈতনিক বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩০। কিন্তু

এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে উৎসাহের উত্তেজনা জাগ্রত রাখা কঠিন ব্যপার। এখন ক্রমশঃ ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পাইতে বসিয়াছে। এই স্কুলে চারিটী শ্রেণী; প্রত্যেক শ্রেণীর পাঠ্য, স্থানীয় হাই-স্কুলের সমূহের সহিত একই রাখা হইয়াছে। ছেলেরা এই স্কুল হইতে বাহির হইয়া যাহাতে হাইস্কুলে উপরের শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে পারে, তাহারই জন্য এইরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

এই স্কুলের ছেলেদিগকে সমাজসেবা বিভাগের বার্ষিক উৎসবের দিন তাহাদের পুরস্কারের সহিত পাঠ্যপুস্তকও দেওয়া হয়। ইহাতে দুই কার্য্যই সাধিত হইয়া থাকে; গরীব ছেলেরা বিনা পয়সায় পড়িবার বইগুলি পায়; এবং সেগুলি যে তাহাদের পরিশ্রম এবং সচ্চরিত্রতার পুরস্কার, তাহাও বুঝিতে পারে। এই নৈশ বিদ্যালয়ে বয়স্ক ছেলেরা পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে আসে। তাহারা যাহাতে নিয়মিত স্কুলে আসে তাহার চেষ্টা করিবার জন্য আমরা সেক্রেটারীকে অনুরোধ করিতেছি। গত বৎসর তিনটী ছেলে এই স্কুল হইতে পাস করিয়া স্থানীয় নবকুমার হাইস্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছে। আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ উহাদের একটীকে বিনা বেতনে পড়িবার অধিকার দিয়াছেন। অন্য দুইটীর বই, বেতন প্রভৃতি সমুদয় ব্যয়ভার এই সেবাসংঘ বহন করিয়া থাকে।

স্কুলে ৩০।৩৫ টীর বেশী ছেলে নেওয়া হয় না। উহাদের পড়ার সব খরচই এই সংঘ হইতে দেওয়া হয়। এই স্কুলের ছাত্রদের জন্য 'সন্দেশ' ও 'শিশুসাথী' এই দুইটী মাসিক পত্র রাখা হয়। এই স্কুলের ভার আমাদের মধ্য হইতে একজনকে হেড্ মাষ্টার নিযুক্ত করিয়া তাহারই উপরে ন্যস্ত করা হইয়াছে। ছেলেদেরই মধ্য হইতে রোজ চারিজন করিয়া এই স্কুলের শিক্ষকতা করিয়া থাকে।

অনেকগুলি কারণ বশতঃ এবারকার সংঘের কাজ তেমন সন্তোষজনক হইতেছে না।

এই সেবাসংঘের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মণ্ডলী ও সহরের ভদ্র মহোদয়গণ হইতে সাহায্য লওয়া হয়। অনেকেই সাহায্য করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন।

এই সেবাসংঘের কার্য্যে মিঃ হার্টগ ও তাঁহার পত্নী উভয়েই আন্তরিক উৎসাহ দিয়া থাকেন। এ বর্ষের সংঘের বার্ষিক উৎসব হইয়াছিল, বিগত ৩রা ডিসেম্বর। সহৃদয়া হার্টগ-পত্নী এই উৎসবে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া, এবং নিজ হাতে স্কুলের ছেলেদিগকে পুরস্কার বিতরণ করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হা হইয়াছেন। মিঃ হার্টগ নিজ জীবনের সেবা কার্য্যের একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়া আমাদের এই উৎসাহকে সতেজ করিয়াছিলেন।

* * *   * * *   * * *

আমাদের হলের তর্কসভা ছাত্রশিক্ষক সকলেরই আন্তরিক্ ইচ্ছা ও প্রচেষ্টার ফলে, এবার গত বৎসর হইতে অনেক উন্নত হইয়াছে। এবার তর্কসভার অধিবেশনও গতবার হইতে বেশী

হইয়াছে। নূতন সেসনে এখন পর্য্যন্ত তিনটি অধিবেশন হইয়াছে। সেসন শেষ হওয়ার আগে আরও হইবে, আশা আছে।

তর্কসভার প্রথম অধিবেশনের বিষয় ছিল "উচ্চ শিক্ষায় সাধারণের অর্থ আরও কম ব্যয়িত হওয়া উচিত" (That public expenditure on higher education should be curtailed)। আমাদের হাউস্ টিউটর শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহার পক্ষে এবং ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ এ, কে, চন্দ, ইহার বিপক্ষে বক্তৃতা করেন; ছাত্রগণও উভয় পক্ষে বক্তৃতা করে। শেষে ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। দ্বিতীয় সভার বিষয় ছিল "চরকা আন্দোলন ভারতের সেরা স্বার্থ সাধনের সহায় নহে" (That the charka movement is not to the best interests of India)। অর্থনীতি ও রাজনীতিশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ মহাশয় ইহার পক্ষে ও ব্যবসা-বাণিজ্য (commerce) বিভাগের মিঃ পি, বি, জুনারকার ইহার বিপক্ষে বক্তৃতা করেন। ছাত্রগণ অধিকাংশই এই প্রস্তাবের বিপক্ষে বক্তৃতা করে। ভোটে প্রস্তাব টি কে নাই। তৃতীয় অধিবেশনের বিষয় ছিল, "সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি প্রথা ভারতের জাতীয়তাস্ফুরণের বিরোধী", (That communal representation is detrimental to the growth of Indian Nationalism). আমাদের ছাত্রবন্ধু শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মুখার্জ্জি ইহার পক্ষে ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহার বিপক্ষে বক্তৃতা করেন। ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এইরূপ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আলোচনা আমাদের পক্ষে খুব উপকারী; এবং কেবল পাঠ্যপুস্তকে ঝুঁকিয়া না থাকিয়া দেশের কঠিন কঠিন সমস্যা সম্বন্ধে এইরূপ চিন্তা করাও প্রকৃত শিক্ষার একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ। আমাদের শিক্ষকগণ ও ছাত্রগণ এইবার এইসব আলোচনায় খুব উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়াছেন। আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে এই উৎসাহ আরও বৃদ্ধি পাইবে।

চতুর্থ অধিবেশনে কলিকাতা সঙ্গীতসঙ্ঘের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সুরতান সহযোগে "সঙ্গীত ও নাট্যকলা" বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। তাঁহার সঙ্গীত সকলেই খুব আনন্দের সহিত উপভোগ করিয়াছিল। আমরা তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

এই তর্কসভায় আমাদের "হল্ ইউনিয়নের" কাউন্সিল ও বিভিন্ন শাখার কার্য্যকলাপ কিরূপ চলিতেছে এবং কোন্ শাখায় কিরূপ পরিবর্ত্তন দরকার, ইত্যাদি নানারূপ বিষয়ের আলোচনাও হইয়া থাকে। বিভিন্ন শাখার সেক্রেটারীগণকে প্রত্যেক ছাত্রই ইচ্ছা করিলে ঐ শাখার কার্য্যসম্বন্ধে প্রশ্নাদি করিতে পারে। কোন শাখায় কোন পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাহা ভোটে করা হইয়া থাকে।

আমাদের প্রোভোষ্ট মিঃ জেঙ্কিন্স্ এই তর্কসভাকে সকল প্রকারে উৎসাহ দিয়া থাকেন।

গত বারের মত এবারও প্রোভোষ্ট মহাশয় তিনটি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। অপ্রস্তুত (Extempore) বিষয়ে বক্তৃতা করিবার জন্য পুরস্কার ২০৲; প্রস্তুত বিষয়ে বক্তৃতার জন্য প্রথম পুরস্কার ১৫৲ ও দ্বিতীয় পুরস্কার ৫৲। "হলের ছাত্রমণ্ডলীর সামাজিক জীবনের উন্নতি" (The development of social life in the Hall) বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিবার জন্যও তিনি একটি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। এই প্রকার কার্য্যে ছাত্রদিগকে উৎসাহশীল ও উন্নত করিবার এই প্রচেষ্টার জন্য আমরা প্রোভোষ্টকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

* * * * * * * * *

এবার ৫ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় আমাদের হলের বার্ষিক সামাজিক সম্মেলন হইয়াছিল। ঢাকা কলেজে গভর্ণরের "বক্তৃতাদিনে" (speech day) সকল ছেলে ও শিক্ষক মিলিয়া একটি বিরাট ভোজের আয়োজন করিত; ঢাকা হলেও সেইরূপ প্রতিবৎসর হলের অন্তর্গত সকল ছেলে ও শিক্ষক লইয়া একটি বিরাট প্রীতিভোজের আয়োজন হয়। সকল ছেলে একত্র মিলিয়া পরস্পর পরস্পরের নিকট পরিচিত হইবার এই শ্রেষ্ঠ সুযোগ। পরন্তু এইরূপ কার্য্যে ছেলেদের মধ্যে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়; এইরূপ উৎসব আমোদে তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধিত ও উদ্দীপনা সঞ্জীবিত হয়।

এবারের সম্মেলন বেশ জমিয়াছিল; মিঃ হার্টগ, তাঁহার পত্নী এবং হলের অন্তর্ভুক্ত অধ্যাপকবর্গ সকলেই উপস্থিত হইয়া আমাদের উৎসবকে সার্থক ও প্রচেষ্টাকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন! হলের মধ্যস্থ প্রকাণ্ড চত্বরে একদিকে সারি সারি চেয়ার-টেবিল সজ্জিত, অপরদিকে বিস্তৃত সতরঞ্চে, হারমোনিয়ম—বিশ্রম্ভালাপ ও গানবাজনার ভিতর দিয়া এই সান্ধ্য-সম্মিলনী জমিয়াছিল বেশ্। চায়ের পেয়ালাভরা উষ্ণতায় শীতসন্ধ্যা আরামের আমেজ দিতেছিল; এমন সময় অপ্রত্যাশিত মেঘ সাজিয়া আমাদের সকল আমোদ ব্যর্থ করিয়া সকল আয়োজন ভাসাইয়া দিয়া গেল! আমাদের আপশোষের সীমা রহিল না।

* * * * * * * * *

সরস্বতীপূজা হলজীবনের আর একটা বিরাট অঙ্গ। ঢাকায় বিশেষতঃ রমনায় যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত, সরস্বতীপূজা একটা দেখিবার জিনিষ। পূজায় ছেলেদের উৎসাহ, তাহাদের যথাসাধ্য বিপুল আয়োজন, সাজসজ্জা, ছাত্রজীবনের এইদিনগুলিকে লোভনীয় করিয়া তোলে। উৎসবের সবটা অঙ্গ ব্যাপিয়া ছেলেদের বিরাট আনন্দ যেন উছলিয়া পড়ে।

প্রতিবৎসরই সরস্বতী পূজায় যাত্রাভিনয় ইত্যাদি হইয়া থাকে, এবারেও হইয়াছিল! অভিনয়ে এত লোকসমাগম হয় যে, স্থানসঙ্কুলান করা দায় হইয়া উঠে। কিন্তু সরস্বতীপূজার সেক্রেটারীর দক্ষতায় ও যত্নে নির্ব্বিঘ্নেই সব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

লেখাপড়া বিষয়ে আমাদের হলের যতটা গৌরব তত বুঝি আর কিছুতেই নয়! আমাদের হলের অন্যতম ছাত্র শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কালীনারায়ণ বৃত্তি লাভ করিয়াছেন; তিনি বি, এ, পরীক্ষায় সকলের সেরা নম্বর পাইয়াছেন। অঙ্কশাস্ত্র, ইতিহাস, অর্থশাস্ত্র, পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতি সকল বিষয়েই আমাদের হলের ছাত্রগণ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ প্রতিসপ্তাহে, সর্ব্বসাধারণের উপভোগ্য ও বোধগম্য বক্তৃতার (Popular lecture) বন্দোবস্ত করিয়াছেন। আমরা কর্ত্তৃপক্ষদিগকে এইজন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি। আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রসায়ন সম্বন্ধে এক সপ্তাহ ধরিয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন। মিঃ পেটাভেল বর্ত্তমান "বেকার সমস্যা" সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এইরূপে ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের এইপ্রকার বক্তৃতায়ও আমাদের যথেষ্ট উপকার হয়।

পরিশেষে আমরা আমাদের প্রোভোষ্ট এবং হাউস টিউটরদ্বয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। বিশেষভাবে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে—যাঁহার অক্লান্ত সদুপদেশ ও সর্ব্ববিষয়ে ঐকান্তিক সাহায্য ব্যতীত আমাদের শতদলকে ফোটাইয়া তুলিতে পারিতাম না—আমাদের প্রাণের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। পরিশেষে, আমাদের সকল ছেলে মিলিয়া একটী একটী করিয়া রচিত'পত্রে' যে শতপত্র গড়িয়া উঠিয়াছে, পূজার শেষে সেই নির্ম্মাল্যটুকু সকলকে বিলাইয়া দিয়া আমরা আজ বিদায় লইতেছি।

ভুল সংশোধন।

১ ম	পৃঃ	১০	ছত্রে	"পূণ্য"	স্থলে	"পুণ্য"	হইবে
১৯ শ	"	২৫	"	"মহার্ঘ্যতা"	"	"মহার্ঘতা	"
৪১ শ	"	৮	"	"গৃহা"	"	"গুহা"	"
৪২ "	"	২৯	"	"শূর্ণ্য"	"	"শূন্য"	"
৪৪ "	"	১১	"	"পলকে"	"	"পুলকে"	"
"	"	২৫	"	"দর"	"	"দরশ"	"
৫৬	"	৬	"	"কৃচ্ছতা"	"	"কৃচ্ছ্রতা"	"
"	"	১৫	"	"আমন্দময়"	"	"আনন্দময়"	"
৯২	"	৪	"	"যরত্ব"	"	"দূরত্ব"	"
	"	৬	"	"নাট্টাভিনয়"	"	নাট্যাভিনয়"	"

---o---